হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

Website : www.hindusamhati.org

Vol. No. 4, Issue No. 5, Reg. No. WBBEN/2010/34131, Rs. 2.00, January 2015

"পূর্ববঙ্গের হিন্দু এবং পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু-শিখ জনগণ স্বাধীনতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত, যে স্বাধীনতার জন্য তাদের অবদান সর্বাধিক। কিন্তু রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার কোন স্থান নেই। তাদের জন্য কেউ একফোঁটা অশ্রুপাত করে না। যদিও এই দুই প্রদেশের অধিবাসীদের আত্মত্যাগেই অবশিষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে।"

—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

সপ্তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

এবার ১৪-ই ফেব্রুয়ারী ইতিহাস নির্মাণ হতে চলেছে

১৪-ই ফেব্রুয়ারী। হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবস। ২০০৮ সালে এই দিনটিতে তার যাত্রা শুরু। বিগত ছয়টা বছর অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে এখন নিপীড়িত হিন্দুর কাছে একটাই নাম—হিন্দু সংহতি। যেখানে হিন্দুরা আক্রান্ত হয়েছে সেখানেই ছুটে গেছে হিন্দু সংহতি। অত্যাচারিতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সেটা দক্ষিণ ২৪ পরগণার নলিয়াখালি, রূপনগর-তারানগর হোক কিংবা বা উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গা, বনগাঁ, স্বরূপনগরই হোক। হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, মালদা বা উত্তর দিনাজপুরেও হিন্দু সংহতি সাধারণ হিন্দুর আশা-ভরসার আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে।

১৪-ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা দিবসে তাই বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার সাধারণ হিন্দু ছুটে আসে কলকাতার বুকে। হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা দিবসকে সাফল্যমণ্ডিত করতে। হিন্দু সংহতি ও তার সভাপতি তপন ঘোষ-এর হাত শক্ত করতে। বিগত বছরগুলোতে বহু সরকারি বাধা অতিক্রম করে, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও কলকাতার বুকে হিন্দু সংহতি তার প্রতিষ্ঠা দিবসকে সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছে। এবারও আমরা সেই আশা রাখছি।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। জেহাদি আক্রমণের করাল থাবা এতদিন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দেখেছি। এখন তা পশ্চিমবঙ্গের বুকে থাবা বসিয়েছে। এবং তা গভীরভাবে। কিন্তু এইসব সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ রয়েছে, সি.বি.আই, র, এন আই এ রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে গ্রামে দুর্বল হিন্দুর উপর যে নিঃশব্দ সন্ত্রাস চলছে, তার মোকাবিলা কে করবে? লাভ জেহাদ, ল্যাণ্ড জেহাদের মাধ্যমে আর একবার বাঙালি হিন্দুকে ভূমিহীন করার চক্রান্ত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। রাজনীতির নেতারা ভোটের লোভে এদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। আর তার সুযোগ নিয়ে লাভ জেহাদের জালে ফাঁসিয়ে হিন্দুর মেয়েদের বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। ল্যাণ্ড জেহাদের মাধ্যমে হিন্দুর জমি, খাস জমি দখল চলছে অবাধে। যত্রতত্র গজিয়ে উঠছে মসজিদ, মাজার। সেখানে মাইক বেঁধে সকাল-সন্ধ্যা আজান দেওয়া হচ্ছে। অথচ মুর্শিদাবাদে শাঁখ বাজানো, উলুধ্বনি দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আর চালু হচ্ছে নবী দিবস। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুর ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে। অথচ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আর রাজনৈতিক নেতারা ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু এ সব অত্যাচারের মোকাবিলা করবে কে? এতদিন দিশেহারা বাঙালি হিন্দু অসহায়ের মতো অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। কিন্তু এখন তারা গভীর অন্ধকারের মধ্যেও এক আশার আলো দেখতে পেয়েছে, আর তা হল হিন্দু সংহতি।

বিগত ছয়-সাত বছরে যেখানেই হিন্দুর উপর অত্যাচার হয়েছে সেখানেই হিন্দু সংহতি-র কর্মী-সমর্থকেরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। হিন্দু সমাজকে বুঝিয়েছে, একবার পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে আমাদের এপার বাংলায় চলে আসতে হয়েছে। অসংখ্য বাঙালি হিন্দু খুন হয়েছে, মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছে। আবার নতুন করে সেই চক্রান্ত এই বাংলার বুকে শুরু হয়েছে। এরই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে হিন্দু সংহতি। গ্রামে গ্রামে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সাধারণ মানুষ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সাড়ে-বারশো গ্রামে হিন্দু সংহতি-র কাজ গড়ে উঠেছে। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারিগুলোতে এইসব গ্রামগুলো থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক কলকাতার বুকে ছুটে এসেছে। গত বছর রাণী রাসমণি এভিনিউ-এর সভায় বিপুল উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। এবার আরও বেশি উদ্দীপনায়, আরও বেশি সংখ্যক কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতিতে ওই রাণী রাসমণি রোডে-ই পালিত হবে হিন্দু সংহতি-র ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে এই সভায় আসার আহ্বান হিন্দু সংহতি-র পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে।

দঃ ২৪ পরগণায় ল্যান্ড জেহাদ ঃ

মহিলাদের উপর অকথ্য অত্যাচার

হিন্দুদের জমির সামনের সরকারী জমি দখল করে হিন্দুর যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া, পরিণামে সেই হিন্দুকে নিজের জমি সেই দখলকারী মুসলমানের কাছে বিক্রি করে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হওয়া। এই পদ্ধতিতেই ল্যান্ড জেহাদ চলছে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ লাগোয়া জেলাগুলিতে। হিন্দু সংহতি কর্মীদের সহায়তায় দঃ ২৪ পরগণার রায়দিঘি থানার ২৭ নং লাট গ্রামে এই পদ্ধতিতে

জমি দখলের একটি অপচেষ্টা রুখে দিল স্থানীয় হিন্দুরা। ব্যাপক সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হল অনেকে। প্রতিবাদী হিন্দু মহিলাদের উপরে চলল অকথ্য অত্যাচার, শ্লীলতাহানি। গুরুতর আহত ও অর্ধনগ্ন অবস্থায় সংহতির সক্রিয় কর্মী ভগবতী হালদারসহ অম্বিকা মন্ডল, পুতুল মন্ডল, রেণুকা মন্ডলদের ভর্তি করা হল রায়দিঘি হাসপাতালে।

গত ২৯ ডিসেম্বর সকালে গ্রামবাসী সুবল মন্ডলের জমির সামনে কাঠ ফেলে জনৈক মুসলমান। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। তাই সুবল মন্ডল কোন ঝুঁকি না নিয়ে কাঠ তুলে নিতে বলে ওই ব্যক্তিকে। পরিকল্পনা অনুসারে সিরাজ সেখ, নাসির সেখ এবং ফরমান ঘরামির নেতৃত্বে দুষ্কৃতিদের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবলের উপর। সুবলের সহায়তায় এগিয়ে আসে স্থানীয় হিন্দুরা। সংঘর্ষে আহত হয় অমল মন্ডল, বিজয় মন্ডল, সুবল মন্ডলসহ আরও অনেকে। হিন্দু মহিলারাও সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। সংঘর্ষে আহতদের রায়দিঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এর আগেও ভাবে প্রচুর জমি দখল হলেও হিন্দুরা বিশেষ প্রতিবাদ করার সাহস দেখায় নি। সম্প্রতি এলাকায় হিন্দু সংহতির প্রভাবে হিন্দুদের সাহস এবং আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। তাই এবার হিন্দুরা সংঘর্ষের পথ নিয়েছে যা প্রতিপক্ষের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাই তারা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশকে মধ্যস্থ করে মিটমাট করে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, যা আগে কখনও হয়েছে বলে জানা নেই। কিন্তু হিন্দুরা চায় ন্যায়বিচার। তাই পুলিশ এবং নেতাদের চাপকে উপেক্ষা করে তারা দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে এফ আই আর করেছে। পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে তারা নিরাপত্তা চায়। কিন্তু পুলিশ-প্রশাসন হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে না পারলে তারা সংঘর্ষের পথে যেতেও পিছপা হবে না। প্রসঙ্গত, সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ ঘটনার পরে এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

জোর করে ইঁট রাখাকে কেন্দ্র করে বচসা মারামারিতে উত্তাল জয়নগরের দুর্গাপুর গ্রাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার অন্তর্গত দুর্গাপুর গ্রামে প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর একটি ক্লাবঘর আছে। ক্লাবের পাশেই হিন্দু সংহতির কর্মীরা একটি হনুমান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। উল্লেখ্য, হনুমান মন্দিরের ডান দিকের দাগের জমির উপর একটি মুসলমান পরিবারের বাস। এক হিন্দু তার জমি তাদেরকে বেচে দেয়।

গত ১লা নভেম্বর, ঐ মুসলমান পরিবারের লোকজন হিন্দুদের জমির উপর প্রায় দুই হাজার ইঁট রাখে। হিন্দুরা ইঁট তুলে নিতে বললে ঐ পরিবারের লোকজনেরা হিন্দুদের জাত তুলে গালাগাল দিয়ে ইঁট তুলতে অস্বীকার করে। হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। তখন ঐ পরিবারের লোকেরা ফোন করে আশাপাশের অঞ্চল থেকে প্রায় একশো-দেড়শো লোক ডেকে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে সেখানে প্রায় সত্তর-আশিজন হিন্দু সংহতির কর্মী এসে উপস্থিত হয়।

শেষাংশ ২ পাতায়

আমাদের কথা

এ কথা ভুলে গেলে চলবে না দেশের অখণ্ডতায় সংবাদপত্রগুলোর একটা ভূমিকা আছে

সাধারণ মানুষকে মূল সমস্যা থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রবণতা সংবাদপত্রগুলোর আজকের নয়। হয়তো এর পিছনে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে, থাকতে পারে সামাজিক ষড়যন্ত্র। এর ফলে সমস্যা হয় এই, যে বীজটা গভীরভাবে সমাজের বুকে গেড়ে বসে আছে তার আগা কাটা পড়লেও গোড়ায় মূল বীজটা থেকেই যায়। তা আবার ধীরে ধীরে বেড়ে মহীরূহে পরিণত হয়। সম্প্রতি দুটি বিষয় পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্রগুলিতে, শুধু সংবাদপত্রগুলি বলি কেন, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, চায়ের আড্ডায় বহুল চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে— এক সারদা কাণ্ড, অপরটি খাগড়াগড় কাণ্ড।

সারদা নিয়ে বেশ কিছুকাল হৈ চৈ চলছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। এই চিট্ ফাণ্ডটি পশ্চিমবঙ্গের সতেরো লক্ষ পরিবারকে পথে বসিয়েছে। গোপন সূত্রের খবর সারদার টাকা বাংলাদেশী জেহাদিদের হাতেও গেছে। প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা চিট্ করার অপরাধে সারদা গোষ্ঠীর সমস্ত কর্মকর্তাকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত। যারা সাধারণের টাকা আত্মসাৎ করে তাদের হাজতবাসই উচিত। কিন্তু সমস্যা হল সারদা কেলেঙ্কারীর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বেশ কিছু নেতা-মন্ত্রীর নাম। গ্রেপ্তারও হয়েছেন কয়েকজন। আর এই ঘটনাটাই বর্তমানে সংবাদপত্রগুলির রসালো নিউজ-এ পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন প্রথম পাতায় ফলাও করে বেরুচ্ছে সেইসব খবর। আর এইসব খবর পড়ে বাসে-ট্রামে-ট্রেনে-চায়ের আড্ডায় উঠছে তর্কের তুফান। একই সঙ্গে গতবছর পুজোর সময় (অক্টোবর) খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণের চাঞ্চল্যকর খবরও বাঙালিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ঘরের এত কাছে কিভাবে জেহাদি কার্যকলাপ এত গোপনভাবে চলছিল তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি আমাদের পুলিশে বা গোয়েন্দা বিভাগ। খাগড়াগড় বিস্ফোরণকে সামান্য একটা বিস্ফোরণ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু তদন্তে উঠে এল জঙ্গী কার্যকলাপের যোগসূত্র। শুধু খাগড়াগড় নয়, এরকম জঙ্গী ঘাঁটি পশ্চিমবঙ্গের অনেক জায়গায় গড়ে উঠেছে। নবগঠিত মাদ্রাসাগুলো এইসব জঙ্গিদের আস্তানা। সেখানে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গি তালিম দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের থেকে বিচ্ছিন্ন করে বৃহত্তর বাংলাদেশের অংশ বলে শেখানো হয়। বাংলাদেশ থেকে উন্মুক্ত বর্ডার দিয়ে প্রচুর জেহাদি জঙ্গী ঢুকে পড়েছে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে। এদের দ্রুত চিহ্নিত করে ওপারে পাঠাতে না পারলে আমাদের সামনে সমূহ বিপদ।

এইরকম পরিস্থিতিতে প্রথম সারির সবকটি সংবাদপত্রই সারদা চিট্ফাণ্ড নিয়ে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। আর তাতেই চাপা পড়েছে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের খবর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন খবরটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নিঃসন্দেহে সারদার সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ-এর ফলে বহু পরিবার পথে বসেছে, বেশ কিছু মানুষ আত্মহত্যা করেছে, কিন্তু সারদার সমস্যা অভ্যন্তরীণ। কিন্তু খাগড়াগড় কাণ্ড ভারতের সার্বভৌমত্বর উপর আঘাত হেনেছে। বৃহত্তর বাংলাদেশ গঠনের যে ষড়যন্ত্র চলছে তাতে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এতবড় বিষয়টা কিছুদিন খবরের শিরোনামে থেকে এখন সংবাদপত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছে। অথচ এই খবরটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারতো। সস্তার বাজারী খবর ছেপে অর্থ-উপার্জন যদি সংবাদমাধ্যমের লক্ষ্য হয়, তবে বুঝতে হবে দেশে ঘোর দুর্দিন এসেছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু বলার সময় এলেই দেখি সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। আসল রহস্যটা কোথায় তা বোঝবার সময় এসেছে।

সম্প্রতি পাকিস্তানে জঙ্গিরা নারকীয় হত্যালীলা চালিয়েছে সামরিক বাহিনীর একটি স্কুলে। যে জঙ্গিদের পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয় দিয়ে আসছে, তারাই আজ ছোবল মেরেছে মনিবপুত্রদের। একশো তেত্রিশটি শিশুকে হত্যা করেছে তারা। কে না জানে, এদেরকে তালিম দেয় পাকিস্তানের কমাণ্ডো বাহিনীর জেনারেলরা। উদ্দেশ্য এইসব জঙ্গিদের দিয়ে ভারত-উপমহাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। কিন্তু বুমেরাং ফিরে এসে নিজেদেরকেই আঘাত করেছে। আর তাতেই জঙ্গি নিধনে তেড়েফুঁড়ে নেমেছে পাকিস্তান সরকার। জঙ্গিদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করে, জঙ্গিদের হত্যা করে, পাকিস্তানের জেলে বন্দি জঙ্গিদের ফাঁসি দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করতে চাইছে তারা। সে দেশের সংবাদপত্রগুলো সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে জঙ্গি কার্যকলাপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও সরকারও যেমন নিশ্চুপে বসে থাকে, সংবাদপত্রগুলোও তেমনি দেশের মূল সমস্যা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করে না। এর পরিণাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তা কি তারা জানেন না! এটা তো আত্মঘাতী নীতি। কারণ জেহাদী আক্রমণের হাত থেকে তারাও কি রেহাই পাবে? ঘরে আগুন লাগলে কুয়ো খুঁড়তে যাওয়া বৃথা হবে। তাই সময় থাকতে সচেতন হতে হবে। আর এই সুমহান দায়িত্বটা পালন করতে হবে সংবাদপত্রগুলোকে। একদিন সংবাদপত্রগুলো ব্রিটিশ সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে জাতীয়তাবাদীর পরিচয় দিয়েছিল। আজ আবার সেই সুমহান দায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে। আর এ কাজ যত তাড়াতাড়ি তারা করবেন, দেশের পক্ষে তা ততই মঙ্গলজনক হবে।

১ম পাতার শেষাংশ

উত্তাল জয়নগরের দুর্গাপুর গ্রাম

এত লোকের সমাগমে বচসা মারামারিতে পরিণত হয়। সংহতি কর্মীদের মারে বেশ কয়েকজন আহত হয়। খবর পেয়ে দ্রুত জয়নগর থানার পুলিশ এসে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে এবং এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে দেয়। পরেরদিন নিমপীঠ সি.আই. জয়দীপ ব্যানার্জী উভয়পক্ষকে জয়নগর থানায় ডাকেন। উভয়পক্ষের লোক থানায় এসে দেখে এস.ডি.পি.ও. (বারুইপুর) থানায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি উভয়পক্ষের কথা শোনার পর সি.আইকে ঐ স্থান থেকে ইঁট সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান। কিন্তু সি.আই. জয়দীপ ব্যানার্জী অল্প কিছু পরিমাণ ইঁট সরিয়ে দেন। তার সদিচ্ছার অভাবে সমস্ত ইঁট সরানো এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। জয়দীপবাবুর এ হেন আচরণের ফলে ঐ অঞ্চলে অশান্তির আঁচ কিছুটা হলেও জিইয়ে রইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সামান্য ঘুড়ি ওড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐ মুসলিম পরিবারের এক ব্যক্তি একটি বাচ্চা ছেলেকে মারধোর করে। ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় জেনারেল ডাইরি করলে থানা থেকে ঐ ব্যক্তিকে ডাকিয়ে ধমকে দেওয়া হয়।

হিন্দু সংহতি কার্যালয়ের পরিবর্তিত ফোন নম্বর ঃ ০৭৪০৭৮১৮৬৮৬

নবী দিবসে অগ্নিগর্ভ গিরিডি ঃ ১৪৪ ধারা জারি

গত ৪ জানুয়ারি, ২০১৫ ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের জন্মদিনে জুলুস এ মহম্মদী-র আয়োজন করা হয়েছিল ঝাড়খণ্ডের গিরিডি শহরে। গিরিডির টুন্ডি রোড হনুমান মন্দিরের কাছে পৌঁছানোর সাথে সাথে মিছিলে অংশগ্রহণকারী মারমুখী হয়ে পড়ে। হনুমান মন্দির লক্ষ্য করে ব্যাপক ইঁট পাথর ছোঁড়া শুরু হয় যাতে প্রায় ১৫ জন আহত হয়। এর মারমুখী দুষ্কৃতিরা একটি যাত্রীবাহী বাস, দুটি ট্রাক, একটি বোলেরো, একটি কার সহ ১৫-১৬টি বাইকে অগ্নিসংযোগ করে। প্রায় এক কিলোমিটার এলাকা দুপুর পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের দখলে চলে যায়। দুপুরের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে দুষ্কৃতিরা পালিয়ে যায়। বিনা কারণে মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা এই ধরণের ঘটনা ঘটানোয় ধারণা হচ্ছে যে, এই ঘটনা সম্পূর্ণভাবে পূর্বপরিকল্পিত। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়।

নারকেলডাঙায় দুষ্কৃতির গুলি, জখম ২

বড়দিনের সকালে নারকেলডাঙা মেন রোডে দুষ্কৃতিদের গুলিতে জখম হলেন দু'জন। পুলিশের দাবি, এর পিছনে রয়েছে স্থানীয় দু'দলের মধ্যে এলাকা দখলের লড়াই। খোদ পুলিশই বলছে, এলাকায় দাপট কায়েম রাখা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর গোলমাল লেগেই থাকে। তার পরেও কেন এলাকাবাসীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, এই ঘটনায় ফের প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়ে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ নারকেলডাঙা পোস্ট অফিসের সামনে স্কুটি-আরোহী দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে একদল দুষ্কৃতি। পুলিশ জানায়, জখম স্কুটি চালকের নাম সেলিম হোসেন। পিছনে বসা সঙ্গীর পরিচয় অবশ্য জানাতে পারেনি পুলিশ। সেলিমের হাতে এবং অন্য জনের পায়ে চোট লেগেছে। দু'জনকেই ভর্তি করা হয়েছে এন আর এস হাসপাতালে।

পুলিশ সূত্রে খবর, এলাকার দখল কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে সেলিম হোসেন এবং সুরিন্দর পাল সিংহ ওরফে গুগগির লড়াইয়ে মাঝে মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নারকেলডাঙা মেন রোড। মাস পাঁচেক আগেও প্রকাশ্যে দু'দলের গুলির লড়াই হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ দিনের ঘটনায় সুরিন্দর ও তার দলবলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে সেলিম। অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু হলেও রাত পর্যন্ত কারও হদিশ মেলেনি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীদের একাংশ জানান, সেলিমের বিরুদ্ধে এলাকায় তোলাবাজি থেকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের অভিযোগ রয়েছে। তাঁদের দাবি, সুরিন্দররা সেলিমের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় এলাকায় সেলিমের দাপট আগের চেয়ে অনেকটাই কমেছে।

অভিযোগ, গত বছর নভেম্বর মাসে প্রকাশ্যেই নারকেলডাঙা মেন রোডে সুরিন্দরকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল সেলিম ও তার দলবল। গুলি সুরিন্দরের বাঁ পায়ের উরু ভেদ করে বেরিয়ে যায়। তাঁর সহকর্মী প্রেমনাথ ঠাকুর জানান, এ দিন সকালে তাঁরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখনই সেলিম ও আর এক ব্যক্তি স্কুটি চেপে যাচ্ছিল। পিছনে একটি স্কুটারে দু'জন মাফলারে মুখ ঢেকে যাচ্ছিল। ওই স্কুটার থেকেই সেলিমকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে দাবি করে প্রেমনাথ বলেন, ''আমাদের কেউ গুলি চালায়নি। আমাদের ফাঁসাতেই এই ছক কষা হয়েছে। সেলিম কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ ও তৃণমূল কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দারের ছত্রছায়ায় রয়েছে।'' যদিও স্বপনবাবু বলেন, ''সেলিমকে আমি চিনি না। শুনেছি, এক সময়ে সিপিএম করত। সুরিন্দররা সিপিএম ছেড়ে আরএসপি করছে।''

লালবাজার সূত্রের খবর, ওই এলাকায় সুরিন্দররা ডাকাবুকো বলেই পরিচিত। আরএসপি-র যুব সংগঠনের নারকেলডাঙা আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক সুরিন্দর ২০০৫ সাল থেকেই সেলিমের দাপট কমাতে এলাকায় পাল্টা দাপট বিস্তার শুরু করে। পুলিশ বলছে, এলাকায় দাপট কায়েমের জন্য দু'পক্ষের প্রায়শই গোলমাল হয়। আগে সেলিম এলাকার হাট থেকে তোলা তুলত। এখন বস্তি এলাকায় বহুতল নির্মাণ শুরু হওয়ায় সেখান থেকেও টাকা আদায়ে হুমকি দেওয়া শুরু করেছিল। সুরিন্দর ও তার দলের ঠিকাদারি ও ইমারতি দ্রব্য সরবরাহের ব্যবসা আছে। পুলিশের একাংশের বক্তব্য, সেলিম যেমন এলাকায় ত্রাস বলে পরিচিত, সুরিন্দরদের সেই পরিচিতি নেই। তাঁদের বিরুদ্ধে পুলিশের খাতায় অভিযোগ থাকার কথা স্বীকার করে প্রেমনাথ বলেন, ''সেলিম ও তার দলবল আমাদের নামে বেশ কয়েকবার মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছে। কিন্তু সব ক'টাতেই জামিন পেয়েছি আমরা।''

কিন্তু সাতসকালে শহরের ব্যস্ত রাস্তায় গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠার পরেও কোন কিনারা করা যাচ্ছে না কেন? পুলিশের বক্তব্য, এই ঘটনার পরে সেলিম তাঁর বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। প্রত্যেকের খোঁজেই তল্লাশি চলছে। এলাকায় পুলিশ পিকেট রয়েছে। পুলিশের আর একটি সূত্র জানাচ্ছে, আগে গুণ্ডামি এবং বোমাবাজির অভিযোগে সেলিমের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। বাড়ি থেকে ইট-পাথর-গরমজল ছোঁড়া এবং বোমাবাজি শুরু হলে শেষ পর্যন্ত পুলিশ ফিরে আসে।

লাভ জেহাদের শিকার নাবালিকা উদ্ধার হাওয়া জেলার আমতায়

দশম শ্রেণীর ছাত্রী সুপর্ণা (নাম পরিবর্তিত) কে লাভ জেহাদী ইসমাইলের হাত থেকে উদ্ধার করল হিন্দু সংহতির কর্মীরা। হাওড়া জেলার আমতা থানার বড় মোহরা গ্রামের বাসিন্দা সুপর্ণা। পাশের গ্রামের ইসমাইল শেখ প্রেমের ফাঁদে ফেলে তাকে নিয়ে চলে যায় সুদূর দিল্লি। প্রায় এক সপ্তাহ খোঁজাখুঁজির পর বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে দিল্লি পুলিশের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করা হয়। হাওড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংহতির প্রমুখ কার্যকর্তা মুকুন্দ কোলের নেতৃত্বে এটি সাম্প্রতিক কালের দ্বিতীয় সাফল্য। প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে সোমা বাগকে মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার করে হাওড়ার সংহতি কর্মীরা।

স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় দুই যোদ্ধা (২)

তপন কুমার ঘোষ

দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কথা আমি উল্লেখ করতে চাই, তিনি সঙ্ঘ পরিবারের বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যে অল্পপরিচিত। যদিও খোঁজ খবর রাখা ব্যক্তিরা তাঁর কথা জানেন। শ্রী দত্তোপন্থ বাপুরাও ঠেংড়ী। সংক্ষেপে দত্তোপন্থ ঠেংড়ী। মহারাষ্ট্রের পূর্ব অংশে ওয়ার্ধা জেলায় আরভি গ্রামে তাঁর জন্ম ১৯২০ সালে। মৃত্যু ২০০৪ সালে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় এঁর অবদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি। যদিও এবিষয়ে কোন আলোচনা এখনও বিদ্বজ্জন মহলে হয়েছে বলে আমার নজরে আসেনি।

আমার সৌভাগ্য হয়েছে শ্রী দত্তোপন্থ ঠেংড়ীজীকে খুব কাছ থেকে দেখার, বহুবার দেখার, তাঁর বহু ভাষণ শোনার এবং তাঁর সঙ্গে এককভাবে অনেকবার দীর্ঘ আলোচনা করার। আমার বাড়ীর কাছেই RSS-এর একজন সঙ্ঘচালক শ্রী অজয় নন্দীর বাড়ী। তিনি আগে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের সক্রিয় কার্যকর্তা ছিলেন এবং তাঁর দাদা স্বর্গত সঞ্জয় নন্দী সঙ্ঘের একজন প্রতিভাবান উজ্জ্বল প্রচারক ছিলেন যাঁর অকালে মৃত্যু হয়েছে। এই সঞ্জয়দা-অজয়দার বাড়িতে ঠেংড়ীজী অনেকবার আসতেন। বলাই বাহুল্য সে সব সুযোগ আমি ছাড়তাম না। এমনকি তাঁর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। গানটা এখনও মনে আছে- 'কি গাবো আমি কি শোনাবো আজি আনন্দধামে।' আমার আরও সৌভাগ্য হয়েছে ১৯৯২ সালে জানুয়ারীতে কল্যাণীতে বিশাল সঙ্ঘ শিবিরে তাঁর সমারোপ ভাষণ বাংলায় অনুবাদ করার।

বাল্যকালে ঠেংড়ীজী স্বয়ংসেবক হলেও উঁচু ক্লাসে পড়ার সময় কিছুদিন তাঁর সঙ্ঘজীবনে ছেদ পড়েছিল। ৪২-এর স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। তারপর আবার সক্রিয় হয়ে সঙ্ঘকাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং প্রচারক হিসাবে প্রথমে কেরল ও পরে পশ্চিমবঙ্গে কাজ করেছেন। বাংলায় তাঁর প্রথম নিযুক্তি হয়েছিল হাওড়ায়। সেই সময় গান্ধীহত্যার অজুহাতে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিল নেহেরু। তখন গুপ্ত অবস্থায় থেকে পশ্চিমবঙ্গ প্রান্তের (রাজ্যের) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। অসম্ভব প্রতিভাবান ছিলেন। মারাঠি, হিন্দি ও ইংরাজী ছাড়াও বাংলা জানতেন বাঙ্গালীর মত আর মালয়ালী ভাষা জানতেন কেরলবাসীর মত। ১৯৪৯ সালে সঙ্ঘের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা ওঠার পর তাঁর মনে কিছু একটা আলোড়ন হয়েছিল। ঠিক যেমন হয়েছিল বালাসাহেব দেওরস, ভাউরাও দেওরস ও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর্তার মধ্যে। তাই তখন শ্রী গুরুজী গোলওয়ালকর প্রায় একবছর তাঁকে নাগপুরে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মহাল এলাকায় সঙ্ঘপ্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের বাড়ির কাছেই একটি ভাড়া ঘরে শ্রীগুরুজী থাকতেন। সেই ঘরেই ঠেংড়ীজী থাকতেন। গুরুজী প্রবাসের মাঝে মাঝে ফিরে এলে অন্তরঙ্গ আলোচনার সুযোগ পেতেন। ঠেংড়ীজীর জীবনে তিনজন মহাপুরুষের ভূমিকা খুব বেশি-শ্রীগুরুজী গোলওয়ালকর, ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়।

ঠেংড়ীজীও শ্রীগুরুজীর কী বিষয়ে একান্তে আলোচনা হত, তা আমি জানি না। কিন্তু অনুভব করতে পারি তাঁরা তাঁদের মেধা, তপস্যা ও দূরদৃষ্টি দিয়ে নতুন স্বাধীন ভারতের সংকটগুলি পর্যালোচনা ও সমাধানের কথা ভাবতেন। সেখান থেকেই প্রেরণা পেয়ে ঠেংড়ীজী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। কিন্তু তা হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। তার প্রস্তুতির জন্য ঠেংড়ীজী ১৯৫০-৫১ সালে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন INTUC-তে কাজ করেছেন এবং কমিউনিষ্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত ডাক ও তার বিভাগ ও রেল কর্মচারী ইউনিয়নে কাজ করে শ্রমিক সংগঠনের কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। আরও সহজভাবে বলতে হলে ট্রেড ইউনিয়ন করার কাজ শিখেছেন।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ ছাড়াও দত্তোপন্থজী ভারতীয় কিষান সঙ্ঘ এবং -স্বদেশী জাগরণ মঞ্চেরও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এই দ্বিতীয়টির সঙ্গে আমিও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। এছাড়াও 'সর্বপন্থসমাদর মঞ্চ' নামে একটি মঞ্চ তিনি শুরু করেছিলেন, যার সঙ্গে আমি একেবারেই একমত নই। এর কোন প্রয়োজন ছিল বা আছে বলে আমি মনে করি না।

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ, সংক্ষেপে বি এম এস ১৯৫৫ সালে শুরু হলেও তা দ্রুত বিস্তারলাভ করেছে। কলকারখানা ও শ্রমিকক্ষেত্রে কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসীরা পুরোনো খেলোয়ার হলেও বি এম এস খুব তাড়াতাড়ি তাদেরকে টেক্কা দিয়েছে এবং সম্ভবতঃ আশির দশকেই ভারতের বৃহত্তম শ্রমিক সংগঠনের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সারা দেশে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা বহু সংখ্যায় এই সংগঠনে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু ঠেংড়ীজীর ইঞ্জিন শক্তি ছাড়া এই অবস্থায় আসা সম্ভব ছিল না বলে আমি মনে করি।

কলকারখানায় শ্রমিকদের উপর মালিকের শোষণ এবং তার ফলে শ্রমিক অসন্তোষ থাকাটা স্বাভাবিক। সেই অসন্তোষকে পুঁজি করে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় মতাদর্শ ও সংগঠনকে বিস্তার করে। সব দেশেই এটা তাদের পরীক্ষিত পথ। ইংলন্ড ও জার্মানীতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু তারা প্রথম সাফল্য পেয়েছিল রাশিয়ায়। কার্ল মার্কসের ভবিষ্যদ্‌বাণী ছিল, শিল্পে বেশি উন্নত দেশগুলিতে সর্বহারাদের বিপ্লব প্রথমে ঘটবে। তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণী সঠিক হয় নি। শিল্পে-কম উন্নত দেশ রাশিয়াতে প্রথম বিপ্লবের নামে ১৯১৭ সালে কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল। মার্কস নিজে কোনদিনই কৃষকদের উপর জোর দেন নি, কারণ কৃষকদের বিপ্লবীসত্তার উপর তাঁর কোন আস্থা ছিল না। কিন্তু রাশিয়ার পর চিনে (যে দেশ ছিল শিল্পে চরম অনুন্নত) সেই কৃষকদেরকে নিয়েই মাও সে তুঙ কমিউনিস্ট পার্টির নামে ক্ষমতাদখল করেছিলেন। যাইহোক, শ্রমিকদের নিয়ে রাজনীতি করা, সেই রাজনীতিকে দলীয় রূপ দেওয়া এবং তা দিয়ে দেশে ক্ষমতা দখল করা কমিউনিস্টদের কাছে পরীক্ষিত পথ। তাই শ্রমিক সংগঠনে তারা সকলের থেকে এগিয়ে। রাশিয়া থেকে প্রেরণা নিয়ে ভারতে যেখানে যেখানে শিল্পাঞ্চল ছিল, সেই সব জায়গাগুলোতেই শুরুর দিকে কমিউনিস্টরা একটু ভাল করে পা রাখতে পেরেছিল। তার মধ্যে মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব উল্লেখযোগ্য। ১৯২৫ সালে উত্তরপ্রদেশের কানপুরে ভারতের কম্যুনিস্টদের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন হয়েছিল। কারণ সেখানে বড় আকারে চর্মশিল্প ও অন্যান্য শিল্প ছিল। শ্রমিক সংগঠনে কমিউনিস্টরা এগিয়ে গেল বলে তাদের দেখাদেখি কংগ্রেসও এই ক্ষেত্রে পা রাখল। কিন্তু এবিষয়ে তাদের কোন নিজস্ব মতাদর্শও ছিল না আর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাও ছিল না। তাই কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন কমিউনিস্টদের শ্রমিক সংগঠনের অন্ধ অনুকরণ করতে লাগল। এর সার্বিক ফল হল সমগ্র শ্রমিকক্ষেত্রে নামে অথবা নাম ছাড়া বিদেশী কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনারই সার্বিক প্রভাব। (এছাড়া নেহেরু সহ কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক বলতে খুবই পছন্দ করতেন।)

ঠিক সেই অবস্থায় দত্তোপন্থ ঠেংড়ী ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কাজ শুরু করলেন যার একটি দৃঢ় জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তি ছিল। অর্থাৎ শ্রমিক ক্ষেত্রে প্রচলিত হাওয়ার বিপরীত মেরু থেকে তিনি এই কাজ শুরু করেছিলেন, যদিও কার্যপদ্ধতি বা টেকনিকের ক্ষেত্রে তিনি হয়তো কমিউনিস্ট শ্রমিক সংগঠনগুলির কিছু অনুকরণ করেছেন। কমিউনিস্টরা শ্রমিকদেরকে শুধুই দাবি করতে শিখিয়েছিল, কোন দায়িত্ব পালন করতে শেখায় নি। ঠেংড়ীজী ঠিক তার বিপরীতে গিয়ে শ্রমিকদেরকে আগে দায়িত্বের কথা বললেন, তারপর দাবির কথা বললেন। তাঁর প্রতিভা উদ্ভাসিত স্লোগানটি ছিল, ''দেশ কে লিয়ে করেঙ্গে কাম, কামকা লেঙ্গে পুরা দাম''। কমিউনিস্টরা শ্রমিকদেরকে শুধু দাবি করতে শিখিয়ে মালিকের প্রতি তীব্র ঘৃণা তৈরি করেছিল। কিন্তু এটুকুতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। এই মালিকরাই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে রাষ্ট্রই শোষণের যন্ত্র-শ্রমিকদের মাথায় এই ধারণা ভালভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তার অনিবার্য ফল শ্রমিককে করা হল শুধু মালিক বিরোধী নয়, রাষ্ট্রবিরোধী। অর্থাৎ বিশাল শ্রমিক সমাজকে দেশপ্রেমহীন করে দেশ বিরোধী করে তোলা হল। এতে কার লাভ হয়? বিদেশী শত্রুর লাভ সব থেকে বেশি হয়। দেশের শ্রমিক শ্রেণী মানে উৎপাদক শ্রেণী। তারা দেশবিরোধী হলে শুধু মালিক বা দেশ শাসকই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, সমগ্র দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, পরিণামে দুর্বল হয়। দেশ দুর্বল হলে বিদেশীর পক্ষে থাবা বসানো সহজ হয়।

কংগ্রেসের শক্তি ও জনপ্রিয়তা চূড়ান্তরূপ পেয়েছিল ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনে। সেই আন্দোলন কংগ্রেসের দলীয় সীমা ছাড়িয়ে জনতার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েছিল। কংগ্রেসের বাইরের বহু দল ও সংগঠনও এর ছোঁয়া থেকে বাঁচতে পারে নি। কিন্তু সেই আন্দোলন সমাপ্তির পর কংগ্রেস ক্রমেই দুর্বল হতে লাগলো। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে গান্ধীর প্রথমে ইংরেজকে সহযোগিতা করা ও তারপর বিরোধিতা করায় তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এছাড়াও আরও অনেকগুলি উপাদান (factor) কংগ্রেসের জনপ্রিয়তাকে কমিয়ে এনেছিল। তার মধ্যে অন্যতম হল নেতাজীর তৈরি আজাদ হিন্দ ফৌজের গঠন ও ভারত অভিযান। এছাড়াও দুটি কারণ/উপাদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এক, মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বাড়বাড়ন্ত, এবং তা রুখতে কংগ্রেসের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। দুই, দলিতদের উপর আম্বেদকরের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট রক্তাক্ত দেশভাগ কংগ্রেসকে আরও দুর্বল করে দিল। নেতাজীর জনপ্রিয়তা ছিল কিন্তু তিনি দেশে নেই। দেশভাগের পাপে গান্ধী নেহেরু ধিকৃত। এই অবস্থায় লোভী বিড়ালের মত চুপিসাড়ে এগিয়ে যাচ্ছিল কমিউনিস্টরা। তারা পাকিস্তানের দাবিকে সমর্থন করে মুসলমানদেরকে কাছে টানতে চেয়েছিল। আবার সেই পাকিস্তান গঠনের ফলেই যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু রিফিউজি হয়ে ভারতে এল, তাদের নিঃস্ব অবস্থার সুযোগ নিয়ে এরা রাজনীতি শুরু করল। এই অনৈতিক খেলায় (কারণ তাদেরই সমর্থনে পাকিস্তান হয়েছে) তারা পশ্চিমবঙ্গের রিফিউজিদের মধ্যে বেশ কিছুটা পা জমাতে পারল।

পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের গোড়ার দিকের ইতিহাস খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করি। একেবারে শুরুতে সাম্যের স্বপ্ন, ক্ষমতা দখলে রাশিয়ান কমিউনিস্টদের সাফল্য ও মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ক্যারিশমা কমিউনিজমের বীজ বপনের কাজ করেছিল। এই বীজে সার-জল দিয়েছিল বৃটিশ শাসকরা। কারারুদ্ধ বিপ্লবীদের কাছে মার্কসীয় সাহিত্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দোসর বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি জি বি)-র নেতা রজনী পাম দত্তকে দিয়ে বিলাতে পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রদের মগজ ধোলাই করে এই সার-জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশশাসক ও কমিউনিস্টদের যৌথ ষড়যন্ত্র প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরী তাঁর লেখা 'দি গ্রেট বিট্রেয়াল' বইতে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে উদ্ঘাটিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যেও এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন লেখক সতীনাথ ভাদুড়ি তাঁর 'জাগরী' নামক উপন্যাসে। চল্লিশের দশক থেকেই আর একটি দিকে কমিউনিস্টরা বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের নবীন প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিয়ে ও উৎসাহিত করে মার্কসীয় পন্থার দিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। শম্ভু মিত্র, সত্যজিত রায়, উৎপল দত্ত, হেমন্ত মুখার্জী, সলিল চৌধুরী, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি তারই ফসল। বাঙ্গালি হিন্দু মানসে এর ফল হয়েছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। এ থেকে এখনও আমরা মুক্ত হইনি। তা সত্ত্বেও ষাটের দশক পর্যন্ত কমিউনিস্টদের গণভিত্তি বাংলায় তৈরি হয় নি। তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর কমিউনিস্টদের এই গণভিত্তি তৈরি হয়েছে। তা অবশ্যই ফাঁক তালে নয়, নিষ্ঠাবান ও আদর্শবান কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমে। প্রথম স্তম্ভটি রিফিউজি, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই যার শুরু। দ্বিতীয় স্তম্ভটি কলকাতা সংলগ্ন শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকবর্গের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, যার শুরু ষাটের দশকে। পরিণামে বাংলার শিল্প ধ্বংস। তৃতীয় স্তম্ভটি প্রায় গোটা বাংলায় ভূমিহীন শ্রমিক, প্রান্তিক (ক্ষুদ্র) চাষি ও বর্গাচাষিদের মধ্যে দাবি দাওয়ার আন্দোলন করে। গণভিত্তির এই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্টের নামে আংশিক ক্ষমতা দখল এবং ১৯৭৭ সালে পূর্ণক্ষমতা দখল। তারও আগে ১৯৫৭ সালেই কমিউনিস্টরা নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে কেরলে ক্ষমতা দখল করেছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তাঁর বাবার সরকারকে দিয়ে অগণতান্ত্রিকভাবে ঐ কমিউনিস্ট সরকার ভেঙে দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের পর ত্রিপুরাতেও কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করেছিল, যা তারা এখনও ধরে রেখেছে।

কেরল, বাংলা ও ত্রিপুরা-শুধু এই তিনটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলেও দেশের বহু স্থানেই

(শেষাংশ ৪র্থ পাতায়)

হিন্দু সংহতির ষষ্ঠ বার্ষিক বৈঠক সম্পন্ন হল

হিন্দু সংহতির ষষ্ঠ বার্ষিক বৈঠক সম্পন্ন হল কলকাতায়। গত ২০ ডিসেম্বর সকাল থেকে ২১ ডিসেম্বর দুপুর পর্যন্ত চলল এই বৈঠক। প্রায় ১০০ স্থান থেকে ২০৬ জন বাছাই করা সংহতি-কর্মী এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। ২০১৪-র কাজের পর্যালোচনার সাথে সাথে ২০১৫-র পরিকল্পনাই ছিল এই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয়।

দঃ ২৪ পরগণা জেলার ভোজাটি গ্রামে বস্ত্র বিতরণ

দঃ ২৪ পরগণা জেলার জীবনতলা থানার ভোজাটি গ্রামে বস্ত্র বিতরণ করলেন হিন্দু সংহতির সভাপতি শ্রী তপন ঘোষ। গত ৭ ডিসেম্বর কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট সমাজসেবী-সহ হিন্দু সংহতির একটি দল ভোজাটি গ্রামে পৌঁছায়। আশপাশের আরও চারটি গ্রামের দুঃস্থ পরিবারের লোকেরা এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। সংহতি কর্মীরা আগে থেকেই ৪টি গ্রামের দরিদ্র তপশীলি জাতির ৩০০ জনের নামের তালিকা করে রেখেছিলেন। এখানে কম্বল, শীতবস্ত্র, বাচ্চাদের স্কুল ড্রেস এবং অন্যান্য পোশাক সমবেত জনতার হাতে তুলে দেন সংহতির কার্যকর্তারা।

৩ পাতার শেষাংশ

স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় দুই যোদ্ধা (২)

কমিউনিস্টদের কমবেশী প্রভাব ছিল। এর মধ্যে উল্লেখ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, হিমাচল, অন্ধ্রপ্রদেশ। অনেক জায়গা থেকেই তাদের দু-চার জন করে এম এল এ নির্বাচিত হত। এই প্রভাবক্ষেত্রগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল শিল্পাঞ্চল বা কলকারখানা এলাকা। অর্থাৎ বাংলায় কমিউনিস্টদের গণভিত্তির যে তিনটি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটি স্তম্ভ শিল্প-শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজ সারা দেশেই বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিল। কারণ সহজেই বোঝা যায়-ট্রেড ইউনিয়নের কাজে তাদের অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা। এদিকে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা সারা দেশেই কমতে শুরু করেছিল। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে ভারতে ১২টি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছিল। এই রাজ্যগুলিতে অকংগ্রেসী জোট সরকার নির্বাচিত হয়েছিল। সব মিলে পরিস্থিতিটা এরকম হয়েছিল যে, কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাস, শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, কমিউনিস্ট পার্টির সামনে সারা দেশে বিস্তার লাভ করার সুবর্ণ-সুযোগ এনে দিয়েছিল। ইতিমধ্যেই এই মঞ্চে জোরালোভাবে পা রেখেছে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ।

এইবার আমাদের যেতে হবে আর একটি রঙ্গমঞ্চে। তা হল বিশ্ব রঙ্গমঞ্চ। জার্মান-জাপানী জোটকে পরাস্ত করতে একসঙ্গে হাত মিলিয়েছিল সাম্যবাদী রাশিয়া ও পুঁজিবাদী ইংলন্ড-আমেরিকা। বিশ্বযুদ্ধ শেষ। জার্মানী-জাপান পরাজিত। তাদের মাথা অবনমিত। কিন্তু তথাকথিত সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ তো একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। আবার মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪ ও ১৯৩৯) লড়ে এত তাড়াতাড়ি আবার যুদ্ধেও তো নামা যায় না। তাই শুরু হল ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা 'কোল্ড ওয়ার'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের কোমর ভেঙ্গে গিয়েছে। সাম্রাজ্য অনেকটা গুটিয়ে নিতে হয়েছে। তাই ঠাণ্ডা যুদ্ধের দুই খেলোয়াড় হল আমেরিকা ও রাশিয়া। বাকী দেশগুলো সাইডরোল প্লে করতে বাধ্য হল এবং হয় রাশিয়া অথবা আমেরিকার দিকে যোগ দিল। আর ভারতের নেহেরু জোট নিরপেক্ষতার ভণ্ডামি করতে লাগলেন। মিশরের রাষ্ট্রপতি নাসের-এর মত তাঁর কিছু সহযোগীও জুটল। আমেরিকার জোটের মধ্যে কয়েকটি দেশ ন্যাটো চুক্তিভুক্ত হয়ে সরাসরি সামরিক ভাবে জোটবদ্ধ হল। কিন্তু তার বাইরেও বহুদেশকে প্রভাবিত করে আমেরিকা তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যকে বিস্তার করল। মহাসাগরের অন্যপাড়ে অবস্থিত বলে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে প্রত্যক্ষ সৈন্য মোতায়েন করা আমেরিকার পক্ষে ভৌগলিক কারণে কিছুটা অসুবিধাজনক ছিল। কিন্তু রাশিয়া ইউরেশিয়া ভূখণ্ডেই অবস্থিত বলে ভৌগলিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপের রণাঙ্গনে জার্মান শক্তিকে পরাস্ত করতে যে সব দেশে রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করছিল (ইংলণ্ড, আমেরিকার সহযোগিতায়), তার মধ্যে কিছু কিছু দেশে ও কিছু দেশের কিছু অংশে তার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের পরেও রেখে দিল। এগুলো থেকে রসদ সংগ্রহ করা, তার সম্পদ শোষণ করা ও ঐসব দেশের সামরিক বাহিনীকে কব্জা করে নিজের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা ছিল কমিউনিস্ট রাশিয়ার বিশেষ প্রক্রিয়া। যুদ্ধ শেষের পরে নরঘাতক স্ট্যালিনের সাম্রাজ্যলিপ্সা আরও বেড়ে গেল। তিনি পূর্ব ইউরোপের সব দেশগুলিকে গ্রাস করে সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অঙ্গ করতে উদ্যত হলেন। তাঁর সেই সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সায় মদত দিল ঐসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি। এর মধ্যে একটা খেলা ছিল। সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়ে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি অনুগত ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আর ঐসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতাদেরকে গুপ্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে (Bribing) ঐ নেতাদেরকে সোভিয়েতের অনুগামী বা এজেন্টে পরিণত করা হয়েছিল যা সাধারণ মানুষ জানতে পারতো না। এই দুয়ের মিলিত ফল হল-দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সোভিয়েত রাশিয়ার দালাল বা এজেন্ট পরিণত হল। ভারতেও ঠিক তাই হয়েছিল।

এই দালাল কমিউনিস্টপার্টিগুলির দ্বারা শ্রমিক আন্দোলনের নামে দেশের শাসনব্যবস্থাকে বুর্জোয়া আখ্যা দিয়ে শ্রমিক আন্দোলন তৈরি করা হল। উদ্দেশ্য শ্রমিকদের ভাল করা নয়, দেশের প্রতি আনুগত্য নষ্ট করে দেওয়া। তার পরের পদক্ষেপ ঐ সব দেশের মেহনতি মানুষদের রক্ষা করতে, বিপ্লবের কুঁড়িটিকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে সাম্যবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার সেনাবাহিনীর আগমন। দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করা হল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিদূত হিসেবে সোভিয়েত সেনার আগমন। রাষ্ট্রকে তো শোষণের যন্ত্র হিসেবে আগেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব—এসবের গুরুত্ব শ্রমজীবী মানুষের কাছে গৌণ করে দেওয়ার সুচতুর চক্রান্ত করতে লাগলো সোভিয়েতের দ্বারা সুবিধাপ্রাপ্ত দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব। পরিণাম পূর্ব-ইউরোপের একের পর এক দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের যূপকাষ্ঠে বলি হতে লাগলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সোভিয়েতের পদানত হল পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড (১৯৩৯-১৯৫৬), বাল্টিক রাজ্য সমূহ (১৯৪০-১৯৯১), ফিনল্যাণ্ডের একাংশ (১৯৪০), পূর্বতন রোমানিয়ার বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকোভিনা (১৯৪৯), ইরানের উত্তর অংশ (১৯৪১-৪৬), হাঙ্গেরি (১৯৪৪), রোমানিয়া (১৯৪৪), চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া। এই প্রক্রিয়ায় তাদের সর্বশেষ দখলটি ছিল ১৯৭৯ সালে নাজিবুল্লাকে সামনে রেখে আফগানিস্তান দখল। গুরুত্বপূর্ণ দেশ পূর্ব জার্মানী তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এক কথায় প্রায় গোটা পূর্ব ইউরোপ তারা পদানত করে ফেলেছিল। তাছাড়াও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি আরও কিছু দেশ। তাদের নিয়ন্ত্রণে না থাকলেও চিন ও যুগোশ্লাভিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন ছিল। সুতরাং কমিউনিস্টরা বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আধিপত্যের স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল। ১৯৫৫ সালে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বুলগানিন ও রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী নিকিতা ক্রুশ্চেভের ভারত সফর ভারতের কমিউনিস্টদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। তাঁরা দুজনে পাঞ্জাব, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর, মাদ্রাজ ও কলকাতা ভ্রমণ করেছিলেন। রাশিয়ার পয়সা খাওয়া বামপন্থী ঐতিহাসিকরা এই সফরকে ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ঐতিহাসিক যাত্রা আখ্যা দিয়েছিলেন। আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট যে সোভিয়েত শাসকরা তাঁদের আগামী সাম্রাজ্য সার্ভে করতে এসেছিলেন। সহযোগিতায় বর্ণচোরা, ভন্ড, দেশপ্রেমহীন নেহেরু। বুলগানিন ও ক্রুশ্চেভ দেখতে এসেছিলেন এখানকার কমিউনিস্ট পার্টি আর কতটা জনপ্রিয় বা প্রভাবশালী হলে তাঁরা শোষিতের মুক্তিদাতা রাশিয়ার সেনাবাহিনীকে ভারতে পাঠাবেন। এবং এদেশে কোন এক কমিউনিস্ট নেতাকে পুতুল করে সামনে রেখে ভারতের ক্ষমতা দখল করবেন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারত তো সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের কাছে সোনার খনি। গজনীর মামুদ থেকে ধূর্ত বৃটিশ পর্যন্ত একই কাহিনী। অগাধ প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার ভারতের কাছে ইউরোপের দেশগুলিতো তুচ্ছ। সেই ভারতকে শোষণ করতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কমিউনিষ্ট রাশিয়া তার চালগুলি খুব সুচতুরভাবে চালছিল। সে বর্ণনায় যাওয়ার অবকাশ এই প্রবন্ধের পরিসরে নেই। বহু শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতাদের সেই সময়কার ভূমিকা দেখলে যে কোন দেশভক্ত মানুষের ঘৃণা হবে। বোঝার জন্য একটি নাম নিতে চাই—অধ্যাপক হীরেন মুখার্জী।

কিন্তু এই খেলাকে সফল করতে হলে সব থেকে বড় হাতিয়ার ছিল কলকারখানার শ্রমিক শ্রেণী। শিল্প শ্রমিকরা খুব কাছাকাছি থাকেন ও খুব অল্প জায়গার মধ্যে কাজ করেন বলে তাদেরকে সংগঠিত করা সহজ। এই সহজ পথে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের বড় অংশকে কব্জা করে, তার দ্বারা রাজনৈতিক প্রভাব বাড়িয়ে আরও কিছু রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে পারলেই পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মত ভারতেও সোভিয়েত সেনা ঢুকে যেত। মুসলমান ও ইংরেজের হাতে পরাধীনতার পর ভারত তৃতীয়বার পরাধীন হত এবং কমিউনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের শিকার হত।

সেই খেলাটাকেই বানচাল করে দিলেন দত্তোপন্থ ঠেংড়ী। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর সেই সংগঠন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে। শ্রমিক সমাজে প্রভাব বিস্তার করল। শ্রমিকদের দাবি দাওয়াকে গুরুত্ব দিয়েও ফিরিয়ে আনলো জাতীয়তাবাদী ধারায়। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদের' বদলে 'ভারতমাতা কী জয়' ধ্বনি উঠলো শ্রমিকদের মুখে। আর এস এস-এর সংগঠন ও কমিউনিস্টদের ধর্মদ্রোহিতা ঠেংড়ীজীর এই কাজের সহায়ক হয়েছিল। মনে রাখতে হবে এই কাজ করতে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন সক্ষম ছিল না। কারণ এই দলের ও তার নেতাদের দেশপ্রেম বাস্তবে নেহেরু পরিবার ভজনায় পরিণত হয়েছিল। এই নেহেরু ভজনা দেশের মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। তাই আমাদের এই বিরাট দেশের বিশাল শ্রমিক সমাজকে কমিউনিস্টদের দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়ার পথ থেকে সরিয়ে এনে দেশপ্রেমের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করেছিল ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। গুরুজী গোলওয়ালকারের দূরদৃষ্টির আলোকে দত্তোপন্থ ঠেংড়ী এই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘকে জন্ম দিয়েছেন এবং তাকে পরিণত করে তুলেছেন। তাই আমি মনে করি স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় দত্তোপন্থ ঠেংড়ীর অবদান অনস্বীকার্য। আমি আশাকরি আগামী প্রজন্মের রাষ্ট্রবিদ্যা ও ইতিহাসের গবেষকরা এ সম্বন্ধে আরও বিশদ গবেষণা করবেন।

বুদ্ধগয়া ও দিঘায় নিয়ে গিয়ে 'ধর্ষণ' বিদেশিনীকে

'ট্যুরিস্ট ভিসা' নিয়ে কলকাতায় এসে শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ ও টাকা খোয়ানোর অভিযোগ করলেন জাপানের এক তরুণী। তদন্তে নেমে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

অভিযোগ কলকাতা পুলিশে হলেও কোনও ঘটনাই শহরে ঘটেনি। অভিযোগ অনুযায়ী কলকাতার সদর স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে ওই তরুণীকে নিয়ে যাওয়া হয় দিঘা, সেখান থেকে ফের কলকাতা হয়ে বুদ্ধগয়ায়। ধৃতদের মধ্যে সাবির খান, ওয়াসিম খান এবং শাহিদ ইকবাল তপসিয়ার বাসিন্দা। জাভেদ খান ও সাজিদ খানকে বুদ্ধগয়ায় ফতেপুর থেকে ধরা হয়েছে। শাহিদ সদর স্ট্রিটে 'জাপানি শাহিদ' নামে পরিচিত বলে পুলিশের দাবি। চক্রে আরও কয়েকজন আছে বলেও দাবি পুলিশের।

তবে এই ঘটনায় বেশ কিছু প্রশ্ন ও ধোঁয়াশা আছে বলে জানান তদন্তকারীরা। কারণ তরুণীর অভিযোগ, তিনি ২০ নভেম্বর কলকাতায় আসেন। ২৩ এবং ২৪ নভেম্বর দিঘায় ছিলেন। সেখানে তাঁর টাকা হাতিয়ে শ্লীলতাহানি করা হয়। ২৫ নভেম্বর শহরে ফিরে আবার বুদ্ধগয়ায় গিয়ে তিনি গণধর্ষিতা হন। কিন্তু অভিযোগ দায়ের করতে এক মাস লাগল কেন, তা ভাবাচ্ছে পুলিশকে। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রের খবর, ওই তরুণী কোন হোটেলে ওঠেন, তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। সদর স্ট্রিটে নিয়ে গেলেও পুলিশকে হোটেলটি দেখাতে পারেননি তিনি। অদৌ তিনি কোনও হোটেলে উঠেছিলেন কি না, ধন্দে তদন্দকারীরা।

বছর চব্বিশের ওই তরুণীর অভিযোগ, ২০ নভেম্বর তিনি সদর স্ট্রিটের একটি হোটেলে ওঠেন। ইংরেজি তেমন না জানায় হোটেলে পরিচয় হওয়া জাপানি ভাষা জানা দুই যুবককে গাইড হিসেবে সঙ্গে নেন। ওই যুবকেরাই গত ২৩ নভেম্বর তাঁকে দিঘায় নিয়ে যায়। তরুণীর অভিযোগ, দিঘায় গিয়েই তারা তরুণীর এটিএম কার্ড নিয়ে নেয় এবং অস্ত্র দেখিয়ে কার্ডের পিন-ও জেনে নেয়। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ৭৬ হাজার টাকা হাতিয়ে ওই দু'জন সেখানে তাঁর শ্লীলতাহানি করে। এর পরে তারা তাঁকে গাড়িতে করে ২৫ নভেম্বর কলকাতায় এনে সেই গাড়িতেই অন্য তিন যুবকের হাতে জোর করে তুলে দেয়। তারা ওই তরুণীকে নিয়ে চলে যান বুদ্ধগয়ায়।

তরুণীর অভিযোগ, বুদ্ধগয়ায় তাঁকে দু'সপ্তাহ আটকে রেখে ধর্ষণ করা হয়। তার পরে জোর করে বারাণসীর বাসে তুলে দেওয়া হয়। সেখানে তরুণীর পরিচয় হয় কয়েক জন জাপানি পর্যটকের সঙ্গে। তাঁরাই জানান, সদর স্ট্রিটে একটি চক্র সাইড সেজে জাপানি পর্যটকদের এভাবে প্রতারণা করে। তরুণী বুঝতে পারেন, তিনিও এই চক্রের শিকার।

কিন্তু অভিযোগ জানাতে তরুণীর এক মাস লাগল কেন? তা ছাড়া, বারাণসীতে জাপানি পর্যটকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে ওই তরুণী তাঁদেরও কিছু বলেননি কেন? তদন্তকারীদের দাবি, তরুণী জানিয়েছেন, তিনি একা থাকায় অভিযোগ জানাতে ভয় পেয়েছিলেন। তাই কলকাতায় ফিরে জাপানি দূতাবাসে জানান। দূতাবাস থেকে পুলিশ কমিশনারকে জানালে তিনি তদন্তের নির্দেশ দেন। তরুণীর কাছ থেকে পুলিশ প্রথমে প্রতারণা এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ পায়। পরে গোপন জবানবন্দিতে তিনি গণধর্ষণের অভিযোগ জানান বলে তদন্তকারীদের দাবি।

পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, জেরায় বুদ্ধগয়া থেকে ধৃত জাভেদ এবং সাজিদ দু'জনেই গণধর্ষণের কথা মেনে নেয়। তবে কলকাতার শাহিদ ওই তরুণীর আচরণ নিয়ে পাল্টা অভিযোগ করেছে।

গোয়েন্দাপ্রধান পল্লবকান্তি ঘোষ বলেন, ''কনস্যুলেট থেকে অভিযোগ পেয়ে আমরা বুদ্ধগয়ায় গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যে একটি চক্রের সন্ধান পাই। সদর স্ট্রিটে এই চক্রটি মূলত জাপানি পর্যটকদেরই 'টার্গেট' করে। আগেও এমন অভিযোগ এসেছে।'' জাপানি দূতাবাসের তরফে বলা হয়েছে, ''এটি খুবই সংবেদনশীল বিষয়। কোনও ভিআইপি দূতাবাসের মাধ্যমে এলে আমরা দোভাষীর ব্যবস্থা করি। কিন্তু সাধারণ পর্যটকেরা হোটেল থেকেই সুবিধামতো দোভাষী বা গাইড নেন।''

গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, জাপানি ভাষায় দক্ষতা এবং জাপানি স্ত্রী এই দুই বিষয়কেই হাতিয়ার করে এই চক্রটি সহজেই জাপানি পর্যটকদের বিশ্বাস অর্জন করে। এমনই নানা তথ্যপ্রমাণ গোয়েন্দারা পেয়েছেন।

কিন্তু টাকা হাতানো এবং অত্যাচারের জন্য তরুণীকে দিঘা ও বুদ্ধগয়া কেন নিয়ে যাওয়া হল? গোয়েন্দারা জানাচ্ছেন, জাপানি পর্যটকদের কাছে বুদ্ধগয়া জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। তাই এই চক্রটি কলকাতা ও বোধগয়ার মধ্যে কাজ করে। কলকাতার আশপাশে বেড়াতে যেতে দিঘাকেই নিরাপদ ভেবেছিল তারা।

বাংলাদেশে হিন্দুর উপর অত্যাচার অব্যাহত

বর্ষবরণের রাতে সর্বস্বান্ত হল হিন্দু পরিবার

৩১শে ডিসেম্বর রাতে যখন পৃথিবীর সর্বত্র বর্ষবরণ উৎসবে আনন্দে মাতোয়ারা তখন বাংলাদেশের বর্ষবরণ করা হয় হিন্দুদের দোকানপাট লুট করে এবং ঘরবাড়ি ভাঙার মাধ্যমে।

নোয়াখালির উপকূলীয় দ্বীপ হাতিয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা চালালো সন্ত্রাসবাদী মুসলিমরা। এই হামলার ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। হামলাকারীরা হিন্দুদের সোনা, টাকা, প্রয়োজনীয় জমির কাগজপত্র এবং বিভিন্ন দ্রব্য সহ প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। বুধবার গভীর রাতে উপজেলার চরকিং ইউনিয়নের পশ্চিম গামছাখালি গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে রাজন চন্দ্র দাস (২৫), জুতিরাণী দাস (৪৫), মৌরাণী দাস (১৬), মিনুরাণী দাসকে হাতিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। আহতরা জানান, পশ্চিম গামছাখালি গ্রামে রাজনচন্দ্র দাসের মালিকাধীন একটি বাড়িতে তারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করে আসছেন। কিছুদিন আগে ওই এলাকার রোকেয়া বেগমের (৪৫) পক্ষে বাবুলউদ্দিন (২৯), বেলালউদ্দিন (৩৯), মোছলেহউদ্দিন (৩৮), নাছিরউদ্দিন (৪৫) সহ বেশ কিছু লোক ওই জমি ও বাড়ির মালিকানা দাবি করে। ওই বাড়িতে থাকতে হলে তাদের চাঁদা দিতে হবে অন্যথায় উচ্ছেদ করার হুমকি দেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে অনেকবার সালিশি বৈঠক হয়েছে। কিন্তু বেলালউদ্দিনরা কোন কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। এরপর দাবিকৃত চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে দুষ্কৃতিরা ক্ষিপ্ত হয়ে ৩১শে ডিসেম্বর মাঝরাতে রাজনবাবুদের উপর চড়াও হয়। তাদের প্রচণ্ডভাবে মরোধার করে এবং বাড়ির সমস্ত কিছুই লুটপাট করে নিয়ে যায়। দোকান ও ঘরবাড়িও ভাঙচুর করে। রাজনবাবুদের চিৎকারে পাশের লোকজন ছুটে এসে তাদের উদ্ধার করে হাতিয়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করে। হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি. মোঃ আব্দুস সামাদ ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

এন.জি.ও.-র আড়ালে লাভ জেহাদ

দঃ ২৪ পরগণা জেলার বিষ্ণুপুর থানা এলাকায় লাভ জেহাদের চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটল গত ১৬ নভেম্বর। ১৮ নভেম্বর বিষ্ণুপুর থানায় লাভ জেহাদের শিকার, নাবালিকা সুচরিতা সাউ-এর বিধবা মা একটি অভিযোগ দায়ের করলেও আজ পর্যন্ত কোন পুলিশি পদক্ষেপের খবর পাওয়া যায়নি, যদিও এফ.আই.আর. এর কপি জেলার এস পি, ডি এস পি সহ রাজ্যের আই জি, ডি আই জি এবং গোয়েন্দা দপ্তরকেও পাঠানো হয়েছে।

এই লাভ জেহাদের ঘটনা হল এন.জি.ও.-র আড়ালে। 'আশার আলো' নামে একটি এন.জি.ও. চালান মহম্মদ হানিফ শেখ। আমতলার পানহাটার কাছে এই সংস্থার একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্র পরিচালনায় হানিফের পার্টনার সৈয়দ নুর হোসেন। এক মাস আগে এখানে ভর্তি হয় কৃপারামপুর গ্রামের দিনমজুর প্রমীলা সাউ-এর নাবালিকা কন্যা সুচরিতা। সুচরিতার বাবা স্বর্গত। গত ১৬ নভেম্বর সকাল ১০-৩০ নাগাদ হানিফ শেখ সুচরিতাকে বিশেষ কাজে ডেকে পাঠায়। বিকেল ৪-১৯ মিনিটে সুচরিতার মা প্রমীলার কাছে একটা অপরিচিত নম্বর থেকে (নং ৯৮০৪৮৮৬৫৪০) ফোন আসে। বলা হয় সুচরিতা বাড়ি ফিরবে না, বেশি খোঁজাখুঁজি করলে তাকে খুন করা হবে। প্রমীলা সাহস করে হানিফের বাড়ি গিয়ে মেয়ের খোঁজ করলে হানিফের মা তাকে গালাগালি করে বলে, বেশি বাড়াবাড়ি করলে মেয়েকে কুচিয়ে কেটে ফেলা হবে। এখন থেকে সুচরিতা হানিফের সাথেই থাকবে বলে প্রমীলাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

এরপর প্রমীলা বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি অভিযোগ পত্রে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন যে, হানিফ তার মেয়েকে অপহরণ করে আটকে রেখেছে এবং সে সুচরিতাকে ধর্ষণ করতে পারে এমনকি বিক্রিও করে দিতে পারেন। এন.জি.ও.-র আড়ালে এই ঘটনা শুধুমাত্র ন্যাক্কারজনকই নয়, এক গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত বলেই স্থানীয় মানুষ মনে করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের পরে অসম নেতা-মন্ত্রীদের সাথে জামাত যোগ

পশ্চিমবঙ্গের পরে অসম। নেতা-মন্ত্রীদের সাথে জামাত যোগ। অসমে গ্রেপ্তার শাহানুরকে জেরা করে এবং নলবাড়িতে তার দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে মাটি খুঁজে পাওয়া বাক্সভর্তি নথি ঘেঁটে এন আই এ এই তথ্য জানতে পেরেছে। শাহানুরের সাথে রাজ্যের এক প্রাক্তন মন্ত্রীসহ কমপক্ষে চারজন বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়কের যোগাযোগ রয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, দিসপুরের এম এল এ হোস্টেলে শাহানুরের অবাধ যাতায়াত ছিল বলে জানা গেছে। রাজ্যের শাসকদল কংগ্রেস সহ বিরোধী এ আই ইউ ডি এফ, দুই দলের নেতারাই এই তালিকায় রয়েছে। এ—আই-এর এক তদন্তকারী জানান, শাহনুর জানিয়েছে, সে একাধিক বিধায়কের কাছ থেকে 'আর্থিক' ও 'পরিকাঠামোগত' সাহায্য পেয়েছে। শাহনুরের স্ত্রী সুজানাকে জেরা করে পুলিশ নলবাড়ির মুকালমুয়ায় শাহনুরের দিদি-জামাইবাবুর বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখানে মাটি খুঁড়ে যে নথি-বোঝাই বাক্সগুলি মেলে সেখান থেকেই পুলিশ ও এনআইএ প্রথম জানতে পারে, জামাতুল মুজাহিদিনের বরপেটা মডিউলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মদত রয়েছে। পুলিশের দাবি, শাহানুরকে জেরা করে জানা গিয়েছে শাসক ও বিরোধী একাধিক বিধায়কের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কী, বহুবার সে দিসপুরের বিধায়ক আবাসে এসেছে এবং রাত্রিবাস করেছে। পুলিশ এও জানতে পেরেছে, আগস্টে বিধানসভা অধিবেশন চলার সময় শাহনুর বিধায়ক আবাসেই ছিল। তদন্তের খাতিরে ওই নেতাদের নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। এআইইউডিএফ নেতা তথা ধুবরির প্রাক্তন বিধায়ক রসুল হক বাহাদুর জানান, বরপেটার স্থানীয় ধর্মপ্রাণ যুবক হিসেবেই শাহানুরকে তিনি চিনতেন। সে জেহাদের সঙ্গে যুক্ত তা তিনি জানতেন না। তিনি বলেন, ''শাহানুর মাদ্রাসা ও মসজিদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে আমার সঙ্গে দেখা করে। এ ব্যাপারে সে আরও কয়েকজন বিধায়কের সঙ্গেও দেখা করেছিল। তবে তার সঙ্গে জামাত বা জেহাদের যোগাযোগ নিয়ে তখন কারও ধারণা ছিল না।'' তিনি স্বীকার করেন, শাহানুর বিধায়ক আবাসেও এসেছিল। এই রসুল হক এবং বরপেটার বর্তমান বিধায়ক আবদুর রহিম খান গত অক্টোবর মাসে বরপেটা থেকে ছয় জামাত সদস্য গ্রেফতার হওয়ার পরেই দাবি করেছিলেন, বরপেটায় কোন জেহাদি নেই। সব সরকারের চক্রান্ত। তদন্ত যত এগোবে এরকম উদ্বেগজনক তথ্য আরো বেশি করে সামনে আসবে। দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল ক্ষমতার লোভে মুসলিম তোষণ করে চলেছে এবং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়টা সবার কাছে গৌণ হয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে দেশের শত্রুরা ভারতে বসবাসকারী পাকিস্তানি এজেন্টদের সহায়তায় বিচ্ছিন্নতার জাল বিস্তার করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ এই রকম একজন জেহাদীকে রাজ্যসভায় সাংসদ করে পাঠিয়েছে। রাজ্যে এদের আরও কোন কোন সাগরেদ বিধায়ক বা সাংসদ হয়ে বসে আছে, তা আজ কে বলতে পারে? এদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করলেই সবাই রে রে করে উঠছেন—সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার, সরকারে গেরুয়া এজেণ্ডা। জেহাদীদের সাথে সাথে এই একই সুরে গলা মিলাচ্ছেন আমাদের দেশের সেক্যুলার মিডিয়া, সেক্যুলার বুদ্ধিজীবি, সেক্যুলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। অসম সহ পশ্চিমবঙ্গ জেহাদী সন্ত্রাসবাদীদের পাখির চোখ। কাশ্মীরের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বস্তুতঃ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে এরা সতত সক্রিয়। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লক্ষ্যপূরণের জন্য যারা সব জেনে এবং বুঝেও এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সহায়তা করছে, তাদের দেশের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। দেশের অখণ্ডতা সর্বোপরি। এর সাথে কোন সমঝোতা করা যায় না। দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার এই লড়াইয়ে সবাইকে সম্মিলিত হওয়ার আহ্বান জানাই।

জাগো, তোমরা জাগো

পবিত্র কুমার রায়

সাম্প্রতিক কালে বর্ধমানের খাগড়াগড়ে একটি বিস্ফোরণ হইয়াছে। এখনও পর্যন্ত তদন্তে জানা গিয়াছে ঐ স্থানে মুসলমান সন্ত্রাসীরা গ্রেনেড বানাইত, রকেট লঞ্চার বানানোর প্রযুক্তিও ছিল। কিছুদিন পূর্বেই শারোদৎসব পার হইয়াছে। বহু জনাকীর্ণ স্থানে উহারা বিস্ফোরণ ঘটাইবার পরিকল্পনাও করিয়াছিল। রাজ্য সরকার এমন একটি ভাব দেখাইতেছে, যেন উহারা বিস্ফোরক বানাইত ঠিকই, কিন্তু এদেশে না রাখিয়া বাংলাদেশে পাচার করিত। যেন বাংলাদেশে পাচার করিলে উহার আর কোন দোষ থাকে না। মনে হইতেছে আমাদের বুদ্ধিজীবিগণ, রাজ্য সরকার, পুলিশ প্রশাসন সবাই একযোগে মুসলিম সন্ত্রাসবাদের চামচা হইয়াছে।

কোন সাংবাদিক, সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক সংবাদ মাধ্যম কাহাকেও কি জোরালো প্রতিবাদ বা জনমত সংগঠনের ভূমিকা লইতে দেখা যাইতেছে? গাজা আক্রমণ চলাকালীন আমাদের বাজারী পত্রিকাটিতো একেবারে হামাস সমর্থনকারীর ভূমিকা পালন করিতেছিল। ইয়েজিদিদের, বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য এই বাজারী পত্রিকাটির কোন দায়বদ্ধতা আছে বলিয়া মনে হয় না। বরুণ বাবুর প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রটিও বর্তমানে বহুলাংশে বিপথগামী হইয়াছে। এইমত অবস্থাকে আমরা কি 'ঘুম' বলিতে পারি না?

বহু সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি ও জ্ঞানীগুণীজন বলিবেন আমাদের জিহাদ সম্পর্কে ভয় পাইবার মত অবস্থা এখনও আসে নাই। আমাদের দেশে যাহা ঘটিতেছে উহাতে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমার মত হইল যাঁহার এইরূপ ভাবিতেছেন, তাঁহারা মূর্খের স্বর্গে বাস করিতেছেন। জিহাদ কোন একটি এলাকার জন্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই। সারা পৃথিবীর মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। আরাফাতের ময়দানে শেষ ভাষণে হযরত মোহাম্মদ বলিয়াছিলেন, ''কুল্লে ইখওয়াতুন মুসলিমিন'', অর্থাৎ সারা পৃথিবীর মুসলমানগণ ভাই ভাই। সুতরাং জিহাদ এবং মুসলমান সমার্থক। কিছু কিছু শিক্ষিত মুসলমান হিন্দুদের সামনে নিরপেক্ষ সাজিয়া বড় বড় জ্ঞানগর্ভ কথা বলিয়া হিন্দুগণকে বিপথে চালিত করে। আসলে ইহাদের নৈতিক সমর্থন থাকে জিহাদের প্রতি। আইসিস জঙ্গিরা সিরিয়ার ও ইরাকের বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করিয়া লইয়াছে। সম্পূর্ণ ইরাক এবং সিরিয়া দখল করিবার পরও উহাদের ভূমি তৃষ্ণা মিটিবে ইহা হলফ করিয়া কেহ বলিতে পারিবেন কি? উহাদের ইসলামিক সাম্রাজ্য বানাইবার ইচ্ছা উহাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না ইহাই হলফ করিয়া বলা যায়। কারণ হইল ইসলামী দর্শন অনুযায়ী সারা পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হইল ইসলাম, ইসলামের অনুগামীরা হইল মুসলমান। সুতরাং সারা পৃথিবীর শাসনকর্তা বা সারা পৃথিবীতে বসবাসকারীরা হইবে মুসলমান। এই যুক্তিতে উহারা একের পর এক পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আক্রমণ করিবে আর আমাদিগের বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত জনগণ মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্মের অন্তিম কলা ঘনাইয়া আনিবে, ইহাই পরিলক্ষিত হয়। না, আল কায়েদাই হউক আর আই সি সই হউক, উহাদের নিকটহইতে আমাদিগের মুক্তি মিলিবে না, আমাদের মানসিকতাই উহার প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

হিন্দুধর্মের গুণকীর্তন-এর মাহাত্ম্য প্রচার করিলেই ইহা হইতে হিন্দু জাতি ও সম্প্রদায়কে রক্ষা করা যাইবে না। পরাক্রমশালী, যুদ্ধবাজ ও ক্ষাত্র তেজপূর্ণ হিন্দুজাতিকে জাগ্রত করিতে হইবে এবং উহাতেই আমাদিগের মুক্তি ও স্বাধীনতা মিলিবে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় বলিতে হইতেছে, ''খোল করতাল রাখিয়া রণভেরী বাজান হউক।'' ক্ষত্রিয় বিবেকানন্দর মহাক্ষত্রিয়ের মতই বাণী। হিন্দু ধর্ম না বাঁচিলে উহার আধ্যাত্মিকতাও বাঁচিবে না।

প্রশ্ন হইল কে দিবে এই হিন্দু জাগরণের নেতৃত্ব? বর্তমানে তেমন নেতা তো দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তবে কি আমরা ভাবিব যে আমাদের নেতা নাই। যখন নেতা আসিবে তখন যাহা হয় দেখা যাইবে? না, নেতা কখনও আসেন না। গণ অভ্যুত্থান বা আন্দোলনের মধ্যেই নেতার আবির্ভাব ঘটিবে। আমরা তো আমাদের কাজটি প্রথমে শুরু করি। সময়মতো নেতা আসিয়া হাজির হইবেন এবং হইবেনই।

এইমত অবস্থায় হিন্দুদিগের করণীয় কি? এই প্রশ্নের উত্তরেও বলিতে হইতেছে, প্রশ্নটি যথার্থ নহে। কারণ হইল বর্তমান অবস্থান বুঝিয়া হিন্দুগণকে কি করিতে হইবে ইহাও বলিয়া দিতে হইবে? হিন্দুগণ কি এতই অধম, যে উহাদের কি করিতে হইবে ইহাও বিচার করিবার ক্ষমতা নাই? যদি তেমনই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইতেছে, ''ওহে হিন্দুগণ, নিদ্রা ত্যাগ করো, উঠ, ধর্ম ও জাতি বাঁচাইবার জন্য আপন কর্ম শুরু করো।'' আপন কর্ম কি? আপন কর্ম হইল নিজ ধর্মের মঙ্গলকারী সর্বক্ষেত্রে নির্বাচন করা। নাঃ, অহেতুক মারামারি নয়। তবে আক্রান্ত হইলে প্রতি আক্রমণে উহার শেষ বিচারের দিনের সম্মুখীন করিয়া দেওয়া। রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা আহরণ করা। সমগোত্রীয় ভাই বন্ধুগণ আক্রান্ত হইলে উহার স্বপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করা। হিন্দুধর্মের কোন মানুষ ছোট বা বড় নহে, এই ধারণা মন হইতে গ্রহণ করা। সাবধান, শিয়রে জিহাদ, জিহাদই ইসলামকে এতদূর আগাইয়া আনিয়াছে। পুনরায় আর আগাইতে দিব না, ইহার পর হইতে উহাদের পিছু হটাইতে হইবে, এইরূপ প্রতিক্ষা করিতে হইবে।

পরিশেষে বলিতেছি, ''ওহে হিন্দুস্থান-এর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ। এখনও সময় আছে, সত্বর নিদ্রামুক্ত হও। আগাইয়া আস। তোমার বীর পূর্বপুরুষদের কথা মনে করো। বীরের মত আগাইতে থাক। তোমার এবং তোমার ধর্মের জয় অনিবার্য, কেহ ঠেকাইতে পারিবে না। জাগো, হিন্দু জাগো, না হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

ভিন্ন সুরে ২৫শে ডিসেম্বর পালিত হল উলুবেড়িয়ায়

গত ২৫শে ডিসেম্বর উলুবেড়িয়া হিন্দু সংহতি পরিচালনায় নোনা দলুইপাড়া অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হল সারাদিনব্যাপী এক ধর্মীয় জাগরণ অনুষ্ঠান। এই এলাকায় বসবাস করে এক খ্রীস্টান পরিবার। তারা এইদিন বাচ্চাদের ডেকে নানান প্রলোভন দেখিয়ে উপহারের নামে বাইবেল ও নানান খ্রিস্টান গ্রন্থ দিয়ে এবং নানা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা গল্প শুনিয়ে ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে। বাচ্চাদের মাধ্যমে এটাই তাদের ধর্মান্তরকরণের প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ। তাই তাদের এই কুৎসিত চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হিন্দু সংহতি উলুবেড়িয়া শাখার উদ্যোগে এইদিন এলাকার সমস্ত বাচ্চাদের নিয়ে সারাদিনব্যাপী এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এইদিন বাচ্চাদের সকাল থেকে হনুমান চালিশা পাঠ ও প্রার্থনা সঙ্গীত করানো হয়। দুপুরবেলায় ভোজনাদির পর তাদের নানা ধর্মীয় কাহিনী শোনানো হয়। তারপর নানা আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় যাতে সমস্ত ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করে। সন্ধ্যাবেলায় পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এইদিন এলাকার মানুষজনের সহযোগিতাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

পূর্ব প্রকাশিতের পর

লাভ জেহাদের আদ্যোপান্ত ঃ মহসিনা খাতুন

(দ্বিতীয় পর্ব)

অন্যান্য জেহাদি কৌশলের চেয়ে বর্তমান সমাজের প্রেক্ষিতে অনেক কার্যকরী এবং নিরাপদ এই পদ্ধতি প্রযোগের সুবিধাও বহুমুখী—

প্রথমত, লাভ জেহাদে জেহাদ হয় ভালবাসা বা প্রেমের ছদ্মবেশে। তাই শিকার নিজেও বুঝতে পারেনা যে সে শিকার। সেই ছদ্ম-প্রেমিক তার এতটা যত্নশীলতা প্রদর্শন করে যে, আর পাঁচটা প্রেমিক প্রেমিকার মতো সেই শিকারটিও সমাজের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেই ছদ্ম- প্রেমের জন্য, যা প্রেমিক-রূপী জেহাদির পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, পুলিশ - প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থার পক্ষে এই সমস্যার সনাক্তকরণ অসম্ভব। কেননা প্রেম করা নিশ্চিতভাবেই কোনও অপরাধের মধ্যে পড়ে না।

তৃতীয়ত, ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির গঠনতন্ত্র অনুসারে মেয়েদের যে পরিবারে বিবাহ হবে, সেই পরিবারের উপাধি ধারণ করবে সে। আর এক্ষেত্রে উপাধি পরিবর্তন মানেই ধর্মেরও পরিবর্তন। এই সমাজের মেয়েরা ওই সংস্কারে বেড়ে ওঠে বলে তাদের পক্ষে এটাকে মন থেকে মেনে নিতেও বিশেষ অসুবিধা হয় না। আর ঠিক সেই জন্যই ভারতে এটা চালানো বিশেষ সুবিধাজনক।

চতুর্থত, লাভ জেহাদ বা সমজাতীয় কোনও ধরণের ধর্মান্তরের বিরুদ্ধে কোনও আইন নেই ভারতে। সুতরাং, এই বিষয়টি শাস্তিযোগ্য না হওয়ায় এই বিষয়ে সাধারণ মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

পঞ্চমত, যে কোন ধর্মনিরেপেক্ষ দেশেই আন্তঃধর্ম বিবাহকে নিরুৎসাহিত করার কোনও ব্যবস্থা থাকে না, থাকা উচিতও নয়। কিন্তু এটা একটা বিশেষ সুবিধার দিক লাভ জেহাদিদের কাছে।

ষষ্ঠত, এই জেহাদে অংশগ্রহণ করতে অস্ত্রধারণ বা প্রথাগত জেহাদি ট্রেনিং এর প্রয়োজন নেই। তাই বেআইনি অস্ত্রশস্ত্রের খরচ সংগঠনগুলিকে বহন করতে হয় না। ফলে ধরা পড়ার ভয় ও থাকে না। একটি অতি সাধারণ ঘরের মধ্যেই কয়েকজন মনোবিদ দ্বারা অতি নিরীহ দেখতে জেহাদি ট্রেনিং হতে পারে।

সপ্তমত, যেকথা আমি আগেও বলেছি, সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরাও এই জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। তারা নিন্দিত তো হয়ই না, উল্টে বিষয়টি তাদের উদার মানসিকতার পরিচায়ক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

অষ্টমত, পুলিশ কিছু ঘটনা সনাক্ত করতে পারলেও তাকে নিছকই আর পাঁচটা ভিন্ন ধর্মের প্রেম- বিবাহ বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে, কেননা প্রতিটি ঘটনা এক একটি স্বতন্ত্র ঘটনা। এখানে জেহাদি সংযোগ প্রমাণ করা অসম্ভব প্রায়। তাই সমস্ত অভিযোগ শুধু অভিযোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। সর্বোপরি, যে কথা আগেও বলেছি, সাধারণ মুসলিম নাগরিকদের এই কাজে অংশগ্রহণ করানো সহজ। একদিকে ইহজগতে একাধিক নারীকে বিয়ের মাধ্যমে ভোগসুখ এবং বিধর্মীকে মুসলিম ধর্মান্তরিত করার পুণ্য, অন্যদিকে পুণ্যের ফলস্বরূপ জান্নাত (বেহেস্ত)-এ স্থান পাওয়া এবং ৭২ বা ততোধিক হুরদের সাথে অনন্তকাল যৌনসম্ভোগ সুখ - আল্লাহর পথে জেহাদের পথ যদি এত মজাদার হয়, তাহলে যেসব মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তি জেহাদে যারা উৎসাহী নয় তারাও জেহাদি হয়ে যায়।

এরপর আমরা আলোচনা করবো লাভ জেহাদের বাস্তব প্রয়োগ-কৌশল নিয়ে। বিভিন্ন নামে ব্লকভিত্তিক লাভ জেহাদের কমিটি আছে, যারা কোনো না কোন ইসলামিক সংগঠন অন্তর্ভুক্ত থেকে কাজ করে। এদের কাজ এলাকাভিত্তিক অমুসলিম এবং সুবিধাজনক মেয়েদের লিস্ট তৈরি করা সঙ্গে নিয়মিত হ্যান্ডসাম, গুড লুকিং স্থানীয় যুবকদের বাছা এবং ঘরোয়া পরিবেশে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের দেওয়া হয় দামী পোশাক, ভাল বাইক এবং বেশ কিছু টাকা। সঙ্গে এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ সময় বেঁধে দেওয়া হয় এবং স্কুল কলেজের সামনে রেডিমেড আড্ডা মারার জায়গাগুলোতে তাদের পোস্টিং হয় (নিয়োগ)। তবে এদের মূল টার্গেট হল স্কুল ও কলেজের অমুসলিম মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা। অবশ্য এমন মেয়ে খোঁজার চেষ্টা এদের করতে কষ্ট পেতে হয় না। লিস্ট তাদের হাতে আগেই এসে যায়।

এরপর তারা মেয়েটির বন্ধু বান্ধবীদের কাছ থেকে কিংবা আশেপাশের মোবাইল রিচার্জিং এবং ডাউনলোডিং দোকান ইত্যাদি থেকে মোবাইল নম্বর যোগাড় করে। তারপর শুরু হয় কথাবার্তার ছলে সাইকোলজিক্যাল ট্র্যাপিং-এ শিখে আসা কথাবর্তার সেই ধরণ, যাতে প্রেম এবং যৌনতার এমন এক অনুপাতের মিশ্রণ থাকবে যে মেয়েটি সাধারণত তার প্রেমে পড়ে যেতে বা আকর্ষিত হতে বাধ্য হয়। একটি টার্গেট এর পিছনে দুই সপ্তাহ মতো সময় দেওয়া হয়। একটি টার্গেট এর পিছনে দুই সপ্তাহ মতো সময় দেওয়া হয়, সফল হলে ভাল কথা, নয়তো টার্গেট বদলাতে হবে। মেয়েটিকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলে কিছুদিন দায়িত্বশীল প্রেমিকের অভিনয় করে যাওয়া এবং যৌনতার স্বাদ দেওয়া। তারপর ছয় মাসের মধ্যে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে মেয়েটিকে ইসলাম মতে বিয়ে করে কিছুদিন উপভোগ এবং সন্তান উৎপাদন। নয়ত বিয়ের পর ধর্মান্তর এবং তার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন এবং তারপর আবার একটি মেয়ে। এভাবেই চলতে থাকে ধারাবাহিকভাবে ধর্মান্তরের কাজ। একসাথে চারটি বিয়ের সম্মতি থাকায় মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে যাওয়ার পর অপর মেয়েকে টার্গেট করা যেতেই পারে, কোনও আইনি বাধা তো নেই। তাছাড়া সমস্যা হলে সেই মেয়েটিকে তালাক দিতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে প্রতিটি ধর্মান্তরের জন্য মেয়েদের ক্যাটেগরি অনুসারে ২ থেকে ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত 'ইনাম' দেওয়া হয় জেহাদিকে। সর্বোচ্চ ৭ লাখ টাকা দেওয়া হয় শিখ মেয়েদের জন্য, এবং ব্রাহ্মণ মেয়েদের জন্য ৫ লাখ এবং সর্বনিম্ন অর্থপুরস্কার তপশিলী উপজাতি ভুক্ত হিন্দু মেয়েদের এবং জৈন মেয়েদের জন্য।

এবার আমরা জেনে নেবো, বিয়ের পর সেই মেয়েটির ঠিক কি কি অবস্থা হয়। প্রেমের খাতিরে মেয়েটি প্রথমে বাড়ি ছাড়ে, তারপর ধর্মান্তরিতও হয়। প্রথম কিছুদিন নতুন সংসারে খুব ভালভাবে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই ঘোরের মধ্যে কাটে। প্রেমিক পতি-পত্নীকে নিজের বাড়ি ফিরে আসতে দেয় না। ফলে, ইচ্ছা থাকলেও মেয়েটির বাড়ি ফেরা দুষ্কর হয়ে ওঠে। এর মধ্যেই চলতে থাকে উস্কানিমুলক বই পড়ানো এবং তাদের দ্বারা নিয়োজিত মনোবিদদের দ্বারা প্রস্তুত করা ব্যবস্থার মাধ্যমে নিঃশব্দে মানসিকতা বদলের কাজ। সঙ্গে খাবারের সাথে মিশিয়ে চলতে থাকে বিশেষ কিছু মানসিক রোগের ওষুধ। এই দুই এর সঠিক মিশ্রণে ধীরে ধীরে সেই মেয়েগুলির মানসিকতায় পরিবর্তন আনা হয় যাতে করে কোনোভাবেই সে আর নিজ ধর্মে বা নিজগৃহে ফিরে না যেতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতি একশো শতাংশ এবং স্থায়ীভাবে কার্যকরী নয়, বরং একটা সীমিত ক্ষেত্রেই কার্যকর।

(ক্রমশঃ....)

সরবেড়িয়ায় হিন্দু মিলন মন্দির আক্রান্ত

সংবাদ সূত্রে প্রকাশ গত ২রা জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ সরবেড়িয়া-আগারাটি পঞ্চায়েতের উপপ্রধান (তৃণমূল) কুখ্যাত সাজাহান শেখের নেতৃত্বে শতাধিক দুষ্কৃতি ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্থানীয় হিন্দু মিলন মন্দিরে হামলা চালালো। এই হামলায় ৭নং কুমড়োখালির বাসিন্দা নির্মল সর্দার গুরুতর আহত হয়েছে। তাকে ক্যানিং হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় চিকিৎসক সমীর মণ্ডলের ডাক্তারখানা বন্ধ করে দিয়েছে ওই দুষ্কৃতিরা। তাকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে স্থানীয় তৃণমূল অফিসে দেখা করে সাজাহান শেখের অনুমতি না নিয়ে চেম্বার খুললে পরিণাম ভয়াবহ হবে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, ওই দিন হিন্দু মিলন মন্দিরে গঙ্গাসাগর মেলায় স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোর বিষয়ে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছিল। আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে হিন্দু যুবকেরা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে এসেছিল। মিটিং চলাকালীন হঠাৎ সাজাহানের বাহিনী সেখানে উপস্থিত হয়ে মিটিং বন্ধ করতে বলে। তাদের বক্তব্য, সাজাহানের অনুমতি ছাড়া ওই এলাকায় কোন মিটিং করা যাবে না। মিটিং-এ অংশগ্রহণকারীরা এর প্রতিবাদ জানালে সাজাহানের দল অস্ত্রশস্ত্র সহ তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

প্রসঙ্গত, নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করায় কিছুদিন আগে বিজেপি সমর্থকদের ওপর ব্যাপক হামলা চালায় এই সাজাহান বাহিনী। এই আক্রমণে ২৬ জন গুলিবিদ্ধ হয়। তার মধ্যে ১৩ জনকে পি জি হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে বিজেপি-র কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পরিস্থিতি পরিদর্শনে আসে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহকে তারা রিপোর্টও করে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির যে কোন পরিবর্তন হয়নি, তা এই ঘটনাতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক এলাকাবাসীর কথা, 'পুলিশ ও প্রশাসন সাজাহানের দাসত্ব করছে। হিন্দু মন্দিরে হিন্দুরা মিটিং করবে কি করবে না, এখন তা ঠিক করবে সাজাহান শেখ! আমরা কি পাকিস্তানে বাস করছি?'

কেনিয়ায় জঙ্গি হানা ঃ ধর্ম পরিচয় জেনে হত্যা করা হল মানুষকে

দশদিনের মধ্যে কেনিয়ার নাইরোবিতে দু-দুবার সাধারণ মানুষকে হত্যা করলো আল শবাব জঙ্গিরা। প্রথমবার বাস ছিনতাই করে তারা ২৮ জনকে হত্যা করে, এবারে সন্ত্রাসে বলি হল ৩৬ জন খাদান শ্রমিক।

উত্তর কেনিয়ার ম্যাণ্ডেরা শহরের কাছে কোর্মে খাদানে এক তাঁবুতে প্রায় ২০ জন জঙ্গি মাঝরাতে হামলা চালায়। প্রথমে শ্রমিকদের ঘুম ভাঙিয়ে জঙ্গিরা ধর্মের ভিত্তিতে তাদের আলাদা করে দেয়। তারপর অ-ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের শুয়ে পড়তে বলে তাদের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। তারা চারজনের মুণ্ডচ্ছেদও করেছে বলে সূত্রে জানা গেছে।

ঘটনার দায় স্বীকার করে আলশবাবের মুখপাত্র আলি মহম্মদ বলেছেন, সোমালিয়ায় কেনিয়ার শান্তিবাহিনী পাঠাবার প্রতিবাদে এই হামলা চালানো হয়। তিনি আরও বলেছেন, আমাদের বিশ্বাসে আমরা আপোষ করি না, লক্ষ্য থেকে কখনও বিচ্যুত হই না। অবিশ্বাসীদের মোকাবিলায় আমরা নির্মম হব আর সমস্তরকম বিরুদ্ধ শক্তির হাত থেকে ভাইদের সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবো।

কেনিয়ার ইসলামিক জঙ্গিগোষ্ঠী প্রমাণ করলো ইসলামে অবিশ্বাসীদের হত্যা করাই তাদের কাজ। এই জন্যই তারা খাদান শ্রমিকদের হত্যা করার আগে ধর্ম পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল। এর আগে ২০১৩ সেপ্টেম্বরে নাইরোবি ওয়েস্টগেট মলে জঙ্গিরা ধর্ম পরিচয়ের ভিত্তিতে ৬৭ জনকে হত্যা করেছিল। এটাই ইসলামের বিধান, কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, জঙ্গিরা তা বারবার প্রমাণ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে এই ধরণের ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর ব্যাপক উত্থান সারা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

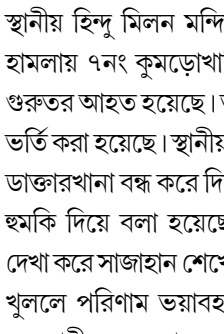

শ্রীশ্রীহনুমানজীর মন্দিরের মহামহোৎসব

পরিচালনায় ঃ— **নাইকুলি রামসেবক (দল) সমিতি**

গভঃ রেজিঃ নং - S/IL/96153

নাইকুলি, মুন্সীরহাট, হাওড়া

অনুষ্ঠান সূচী

১৭ই মাঘ ১৪২১ (১লা ফেব্রুয়ারী,২০১৫) রবিবার

বৈকাল ৩ ঘটিকায় ঃ পথ পরিক্রমা

১৮ই মাঘ ১৪২১ (২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) সোমবার

সকাল ৯ ঘটিকায় ঃ বেলুড়মঠ ও সারদা রামকৃষ্ণ কল্পতরু মিশনের মহারাজ কর্তৃক মন্দিরের পূজারম্ভের আনুষ্ঠান উদ্বোধন।

সকাল ১০ ঘটিকায় ঃ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
'ক'-বিভাগ, ১২ বৎসর পর্যন্ত
'খ'- বিভাগ, সর্বসাধারণের জন্য।
(বিষয়- ভারতীয় সাংস্কৃতি)
সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিঃ।

১) আর্ট পেপার ব্যাতীত সমস্ত আঁকার সরঞ্জাম নিজ নিজ দায়িত্বের।(২) জল রং ব্যবহার করা চলবে।(৩) বিচারকের সিদ্ধান্তচূড়ান্ত অঙ্কন প্রতিযোগীতার সমগ্র অনুষ্ঠানটি আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর্যশিল্পী মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্যামল মুখোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সম্পন্ন হইবে। সহযোগী বিচারক শ্রী জয়দেব চক্রবর্ত্তী ও শ্রী অশোকদাস।

বিকাল ৫ ঘটিকায় ঃ কুইজ প্রতিযোগিতা

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঃ বাউল সঙ্গীত।

১৯শে মাঘ ১৪২১ (৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৫) মঙ্গলবার

সকাল ৯ ঘটিকায় ঃ হনুমানজীর পূজাপাঠ ও হোমযজ্ঞ

বিকাল ৪ ঘটিকায় ঃ ভাগবত পাঠ।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা দেবতার গ্রাস অবলম্বনে নাটক জলদেবতার গ্রাস, রূপায়নে সাথি ও অবলম্বন নটসেনা, পরিচালনায়— অরূপ চৌধুরী (বেতার, দূরদর্শন খ্যাত)।

২০শে মাঘ ১৪২১ (৪ঠা ফেব্রুয়ারী,২০১৫) বুধবার

সকাল ৬ ঘটিকায় ঃ মঙ্গলারতি

সকাল ১১ ঘটিকায় ঃ পূজাপাঠ ও হনুমানজীর মহাভোজ নিবেদন।

দুপুর ১২ ঘটিকায় ঃ ভক্তমাঝে মহাপ্রসাদ বিতরণ (বিকাল ৪টা পর্যন্ত)

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঃ ভাগবত পাঠ ও ভজন কীর্ত্তন।

২১শে মাঘ ১৪২১ (৫ই ফেব্রুয়ারী,২০১৫) বৃহস্পতিবার

সকাল ১০ ঘটিকায় ঃ রক্তদান শিবির, সাথে সাথে রক্ত দাতাদের সম্মানীয় পুরস্কার প্রদান। বিনা ব্যায়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, ফিজিও থেরাপি ও যথাযোগ্য ঔষধ প্রদান।

স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত থাকবেন ঃ আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শল্য চিকিৎসক ডাঃ স্বপন কুমার মাজি, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অজয় কুমার পাল, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞা ডাঃ শর্মিষ্ঠা ঘোষ পাঁজি। জাতীয় খ্যাতি সম্পন্ন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সোমনাথ পাল, জেনারেল ফিজিসিয়ান ডাঃ সৈকত ঘোষ, চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ সমানধন্য ডাঃ অনন্তসিং ফিজিও থেরাপিষ্ট ডাঃ দ্বৈপায়ন চক্রবর্ত্তী, ডাঃ জয়দেব চক্রবর্ত্তী দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ? ডাঃ এস. বেরা। এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বিগত বৎসরের কৃতি ছাত্রীদের বিশেষ পুরস্কার প্রদান ও রক্ত দাতাদের বিশেষ সাম্মানিক প্রদান, অঙ্কন প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ।

সন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটিকায় ঃ নাইকুলি রামসেবক (দল) সমিতির আয়োজনে সম্পাদক দেব কুমার মাইতি কর্তৃক রাবণ বধ অনুষ্ঠান।

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ঃ ভজন সন্ধ্যা (কলকাতা মিউজিক্যাল গ্রুপ)।

রামেশ্বরমে হিন্দু জননেতা সম্মেলনে

১৪ ডিসেম্বর ২০১৪, তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে 'হিন্দু জননেতা সম্মেলনে' মঞ্চে উপবিষ্ট পুডুস্বামী, রমেশ সিন্ধে, অর্জুন সম্পত, বক্তব্যরত সংহতি সভাপতি তপন ঘোষ।

আইসিস-পন্থী টুইটার অ্যাকাউন্টের চালক বাঙালি যুবক গ্রেফতার

আইসিস পন্থী অ্যাকাউন্ট হোল্ডার মেহদি মাসুর বিশ্বাসকে শনিবার গ্রেফতার করল কর্ণাটক পুলিশ। মেহদি মাসুর স্বীকার করে নিয়েছেন @ShammiWitness এই ইউজার নাম নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই এই টুইটার অ্যাকাউন্টটি চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। ২৪ বছরের এই যুবক জানিয়েছেন, ব্রিটিশ আইসিস জঙ্গিদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বেঙ্গালুরুর বহুজাতিক সংস্থার এই কর্মীকে আজ ভোরে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন ও একটি ল্যাপটপও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কর্ণাটকের ডিজিপি এল পাচাউ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন, ''নিজের পরিচয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলেন মেহদি। তাঁর পরিচয় কোনদিনও সামনে আসবে না, এ বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তিনি।'' দিনের বেলায় বেঙ্গালুরুর এই যুবক বহুজাতিক সংস্থার হয়ে কাজ করলেও রাতে সে ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী আইসিস-এর জন্য কাজ করত। ভার্চুয়াল বিশ্বের বাইরে জঙ্গিদের সঙ্গে এই যুবকের কী ধরণের যোগাযোগ ছিল তাই এখনও খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে পুলিশ। মেহদি আদতে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। এখনও এ রাজ্যে তাঁর বাবা-মা ও বোন থাকেন।

'মেহদি' নামের বেঙ্গালুরু নিবাসী এক ব্যক্তি আইসিস-এর টুইটার অ্যাকাউন্ট চালনা করেন। একটি ভারতীয় বহুজাতিক সংস্থার কর্মচারী তিনি। চাঞ্চল্যকর এই তথ্য সামনে এনেছে ব্রিটিশ চ্যানেল ফোর নিউজ। তবে, চ্যানেল ফোর নিউজ ওই ব্যক্তির আসল নাম প্রকাশ করেনি। চ্যানেলটির দাবি ওই ব্যক্তি তাদের কাছে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আসল নাম সামনে এলে তার প্রাণ সংশয় হতে পারে। চ্যানেলটি জানিয়েছে, ''শ্যামি উইটনেস নাম নিয়ে ওই ব্যক্তির টুইট মাসে অন্তত ২০ লক্ষ জন ফলো করে। সম্ভবত আইসিস-এর সবথেকে প্রভাবশালী টুইটার অ্যাকাউন্ট চালায় এই ব্যক্তি। ফলোয়ারের সংখ্যা ১৭,৭০০।'' ইতিমধ্যে বেঙ্গালুরু পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

শ্যামি ইউটনেসের টুইটার অ্যাকাউন্টটি মূলত বিদেশী জঙ্গিরাই বেশি ফলো করত। এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই অ্যাকাউন্টটি ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে। চ্যানেলটির দাবি মেহদি দিনের বেশিরভাগ সময়টাই টুইটারে আইসিস-এর প্রচার চালাত। জঙ্গি, আইসিস সমর্থক এবং কর্মীদের মধ্যে লাগাতার যোগাযোগ চালিয়ে যেত। আইসিস-এর মত জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি সোশ্যাল মিডিয়াকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের মতাদর্শ, কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের সমর্থন বৃদ্ধি ও নতুন কর্মী নিয়োগের কাজও তারা করে চলেছে এই সাইটগুলির মাধ্যমে। জঙ্গিদের কোনও একটি টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেণ্ড করা হলে শ্যামি উইটনেস নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করে সবার কাছে সেটা ফলো করার আবেদন জানাত। ব্রিটিশ জঙ্গিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত সে। তাদের মৃত্যু হলে টুইটারে তাদের শহীদ বলে ঘোষণা করত। ব্রিটিশ চ্যানেলটিকে মেহদি জানিয়েছে পরিবারের জন্যই ভারত ছেড়ে সরাসরি আইসিস যোগদান করতে পারেনি সে।

চড়াবিদ্যার পেটোয়াখালিতে মজুত বোমা বিস্ফোরণ ঃ আহত এক

৫ই জানুয়ারী দুপুর ১২টা নাগাদ জুলমত শেখের বাড়ি থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পায় স্থানীয় মানুষ। জুলমত শেখের বাড়ি দঃ ২৪পরগণার বাসন্তী থানায় পেটোয়াখালি গ্রামে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সেই বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক মজুত করা হয়েছিল। খবর পাওয়া গেছে এই বিস্ফোরণে জুলমত শেখের একটি হাত উড়ে গেছে. চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় কিছু লোক দেখে ফেলে এবং আমাদের প্রতিবেদককে খবর দেয়। বাসন্তী থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি বলেন যে, তারা ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন এবং খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই খবর প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত কোন গ্রেপ্তারের সংবাদ অবশ্য পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, সরবেড়িয়া ও চড়াবিদ্যা সংলগ্ন এই এলাকাগুলি রীতিমত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ প্রবণ এলাকা। কিছুদিন আগে চড়াবিদ্যায় সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। কয়েক হাজার মুসলমান একত্রিত হয়ে গ্রাম সংলগ্ন একটি মন্দির ভেঙে দেয়। প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরাও শক্তভাবে রুখে দাঁড়ায়। এই সময় পুলিশের পক্ষপাতমূলক আচরণের ফলে হিন্দু প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে যায়। পুলিশ সার্চ লাইট নিয়ে রাত্রিবেলায় হিন্দুদের বাড়িতে তল্লাসি করলেও আক্রমণকারী মুসলমানদের এলাকায় তাদেরকে সেরকমভাবে তৎপর হতে দেখা যায় না। এদিকে গত ২রা জানুয়ারী সরবেড়িয়ায় হিন্দু মিলন মন্দিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাজাহান শেখের বাহিনী। মন্দিরের মিটিং জোর করে বন্ধ করে দেয়। একদিকে মুসলিম সমাজের আগ্রাসন, পাশাপাশি পুলিশ-প্রশাসনের মাধ্যমে হিন্দু প্রতিরোধকে দুর্বল করে দেওয়ায় স্থানীয় হিন্দুরা এক অসম লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে যে, এলাকার মুসলিম মৌলবাদী সমাজবিরোধীরা তলায় তলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে। অথচ হিন্দুদের উপরে চলছে পুলিশ-প্রশাসনের চোখ রাঙানি। এই কারণেই স্থানীয় হিন্দুদের বক্তব্য, হয় পুলিশ হিন্দুদের সুরক্ষা দিক এবং দুষ্কৃতিদের শাস্তি দিক, না হয় হিন্দুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা তাদের নিজেদের হাতেই ছেড়ে দিক।

প্রতি মাসে কোটিরও বেশি টাকা বাংলাদেশে, শুরু তদন্ত

জামিনের টাকা জুগিয়ে একের পর এক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে বসিরহাট জেল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এক যুবক। তাতে সন্দেহ হওয়ায় খোঁজখবর করতে গিয়ে পুলিশের সামনে চলে এসেছে ঠিক হাওয়ালার কায়দায় বিশাল অঙ্কের টাকা এ দেশ থেকে বাংলাদেশে পাচার করার চক্র।

টাকার অঙ্কটা এতটাই বেশি যে প্রথমেই চোখ কপালে উঠেছিল উত্তর ২৪ পরগণার পুলিশ কর্তাদের। দেখা যায়, হাসনাবাদের প্রত্যন্ত গ্রামের এক বাসিন্দার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রতি মাসে কোটিরও বেশি টাকা লেনদেন হচ্ছে। আমির আলি নামে সেই লোকটিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাকে জেরার সূত্র ধরে তামিলনাড়ু থেকে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তারা শ্রমিক জোগানের ঠিকাদার। মূলত তামিলনাড়ুর ইরোড জেলায় কাজ করা বাংলাদেশী শ্রমিকেরাই তাদের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠাচ্ছিলেন।

যদিও অতীতে বারবার দেখা গিয়েছে, এই ধরণের বিপুল টাকা চলাচলের সঙ্গে সাধারণত জঙ্গি কার্যকলাপেরও যোগ থাকে। এ ক্ষেত্রেও তেমন কিছু রয়েছে কিনা, তা অবশ্য নিশ্চিত নয়।

বুধবার পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী বলেছেন, ''আপাতত জানা গিয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত বাংলাদেশীদের টাকা প্রতি মাসে তাদের দেশে পাঠানোর কাজ করত চক্রটি। ধৃতদের জেরা করে আরও তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। জঙ্গি যোগের ব্যাপারেও খোঁজখবর শুরু হয়েছে।''

পুলিশ সূত্রের খবর, 'রাহুল দাস' নামে একজন জামিনদার হয়ে বসিরহাটের জেলে আটকে থাকা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে গত কিছুদিন ধরেই খবর মিলছিল। গত ১২ ডিসেম্বর তাকে আটক করা হয়। জেরায় জানা যায়, সে আসলে বাংলাদেশী, আসল নাম মাসুদ বিল্লা। তার আগে কয়েকদিনের মধ্যে সে গোয়া, অসম, তামিলনাড়ু হয়ে বসিরহাটের হাসনাবাদে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জেরায় মাসুদ দাবি করে, হাসনাবাদের আমির আলির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নিয়ে জেল থেকে বাংলাদেশীদের ছাড়াতে হবে বলে তামিলনাড়ুরই কয়েকজন তাকে বরাত দিয়েছিল।

এর পরেই আমির আলিকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সুপার বলেন, ''আমির আলির বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখা যায়, প্রতি মাসে কোটি টাকারও বেশি লেনদেন হচ্ছে। সে-ই জেরায় জানায়, ওই টাকা তামিলনাড়ু থেকে বাংলাদেশে পাঠানোর জন্য তিনজন তাকে বরাত দিয়েছে।''

তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, শুধু ইরোড এলাকাতেই পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশী নানা কাজে যুক্ত রয়েছেন। এঁদের টাকা চোরাপথে পাচারের চক্রে আরও অনেকে জড়িয়ে রয়েছে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। ধৃত পাঁচজনকে বসিরহাট আদালতে তুলে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার পরে বাকিদের খোঁজে পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি শুরু করেছে।

লাভ জেহাদের শিকার নাবালিকা উদ্ধার হাওড়া জেলায়

থানা-জগৎবল্লভপুর, গ্রাম-মানিকপীর, অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী সোমা বাগ (নাম পরিবর্তিত) গত ২২-১২-২০১৪ সোমবার থেকে নিখোঁজ হয়। পরে জানা যায় যে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা, লক্ষ্মীপুর গ্রাম নিবাসী রাজমিস্ত্রী শেখ ইসমাইল নামের ব্যক্তি ঐ নিখোঁজ নাবালিকা সোমা বাগকে ফাঁদে ফেলে তুলে নিয়ে গেছে। গত ২৩-১২-২০১৪ তারিখে ঐ মেয়েটির বাবা-মা হিন্দু সংহতি কর্মীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। সংহতির পূর্ণকালীন কার্যকর্তা শ্রী মুকুন্দ কোলের নেতৃত্বে ২৪-১২-২০১৪ তারিখে সোমা বাগকে উদ্ধার করা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্বর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার অপরাধে আক্রান্ত হল হিন্দুরা

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সমর্থকদের উপর অকথ্য নির্যাতন হল উত্তর ২৪ পরগণা জেলার শাসন থানার অন্তর্গত পাগদা দাসপাড়া গ্রামে। সশস্ত্র দুষ্কৃতিদের আক্রমণে ৫০ জন হিন্দু আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে বিশ্বনাথ দাস ও সোমনাথ দাসকে গুরুতর আহত অবস্থায় বারাসত সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মহিলা ও কিশোরীদের শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। হিন্দুদের একশ'র বেশি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮-৯টি পরিবারের লোকেরা গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছেন। এই অত্যাচারিত হিন্দুদের দোষ---তারা ২০ ডিসেম্বর কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে অনুষ্ঠিত ভি.এইচ.পি. স্বর্ণ জয়ন্তী সমাবেশে যোগ দেন। আক্রমণকারীরা সারা রাত সমগ্র গ্রাম ঘিরে রাখে।

২২ ডিসেম্বর তথাগত রায়-এর নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধি দল পুলিশ প্রহরায় গ্রাম পরিদর্শন করেন। এর আগে তারা জেলা পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বিজেপি-র পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য গ্রামবাসীদের চার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রামে ভি.এইচ.পি. দলের সফরের কোন খবর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গ্রামের মানুষ শাসন পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ দায়ের করতে গেলে থানার ভারপ্রাপ্ত ও.সি. নাসিম আখতার অভিযোগকারীদের তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন বলে জানা গেছে।

অপহরণ করে যৌন নির্যাতন, ইরাকে ফের অভিযুক্ত আইএস

আত্মহত্যা ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না। লাঞ্ছনা আর অপমান থেকে বাঁচতে তাই প্রথমে দু'হাতের শিরা কেটে গলায় দড়ি দিয়ে বাথরুমেই ঝুলে পড়ে বছর উনিশের তরুণী জিলান। ইসলামিক স্টেট অব ইরাক অ্যাণ্ড সিরিয়া-র (আইএসআইএস) সেই ডেরাতেই একই কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চেয়েছিল আরও দুই বোন। শেষমেশ অবশ্য জঙ্গিদের খপ্পর থেকে পালিয়ে বাঁচে তারা। অভিযোগ, তাদের জোর করে জঙ্গিদের শয্যাসঙ্গী হতে বলা হয়েছিল।

গত কয়েকমাসে ইরাকের ইয়াজিদি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিশোরী-তরুণীদের অপহরণ করে অকথ্য যৌন নির্যাতনের অভিযোগ ক্রমশই বাড়ছে আইএস-এর বিরুদ্ধে। নিশানায় মূলত ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে মেয়েরাই। প্রাণের ভয় দেখিয়ে জোর করে বিয়ে, ধর্ষণ প্রভৃতিই যেন আজ নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে দেশের একটা বড় অংশের কিশোরীদের। পালিয়ে বাঁচার বিকল্প পথ একটাই আত্মহত্যা।

ব্রিটেনের মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তরফে আজ এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। দেশের একটা বড় অংশ জুড়েই মেয়েদের উপর নানা বিধিনিষেধের ছড়ি ঘুরিয়ে আসছে এই জঙ্গি গোষ্ঠী। শিক্ষার পাশাপাশি কোপ পড়ছে মেয়েদের কর্মসংস্থানেও।

৭-ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-তে

হিন্দু সংহতি-র ডাকে

১৪-ই ফেব্রুয়ারী ২০১৫, শনিবার, বেলা ১২টায়

বিশাল জনসভা

স্থান ঃ রাণী রাসমণি এভিনিউ, ধর্মতলা, কলকাতা

প্রধান অতিথি
সর্দার কে. পি. এস. গিল
প্রাক্তন ডি.জি.পি, পাঞ্জাব

সভাপতি
তপন ঘোষ
সভাপতি, হিন্দু সংহতি

প্রধান বক্তা
পূজ্য স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ

বিশেষ অতিথি
শ্রী অর্জুন সম্পত্
সভাপতি, হিন্দু মাক্কাল কাচ্চি, তামিলনাড়ু

বক্তা
অধ্যাপক ডঃ শরদিন্দু মুখার্জী
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতি <www.hindusamhatibangla.com>, <www.hindusamhati.org>, <www.hindusamhatitv.blogspot.in>, Email : hindusamhati@gmail.com

PRINTER & PUBLISHER : TAPAN KUMAR GHOSH, ON BEHALF OF OWNER TAPAN KUMAR GHOSH, PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 393/3F/6, Prince Anwar Shah Road, Flat No. 8, 4th Floor, Police Station Jadavpur, Kolkata 700 068, South 24 Parganas,
Editor's Name & Address : Bikarna Naskar, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7417818686